বৃষ্টি এল

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬১

প্রকাশক

জে. এন. সিংহ রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড

২২, ক্যানিং স্ট্রীট

কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট

অজিত গুপ্ত

মুদ্রক

রণজিৎ কুমার দত্ত

নবশক্তি প্রেস

১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড

কলিকাতা-১৪

দু' টাকা

উৎসর্গ

শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী
বন্ধুবরেষু—

ইষ্টি এল

বৃষ্টি এল

অবশেষে সত্যিই বৃষ্টি এল শুভ ১৬ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার বিকালবেলায়।

বৃষ্টি না বলে ঝড় বলাই উচিত, সুদীর্ঘ ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর বৎসরের প্রথম কালবৈশাখী। কিন্তু এবারের কালবৈশাখী ঝড়ের চেয়ে বৃষ্টির স্পর্শটুকু বেশী রেখে গিয়েছে মনে ও মাটিতে। তাই ঝড়ের বদলে বৃষ্টির সম্মানই তাকে দিলাম।

সকাল বেলা আকাশের কোদালে মেঘ দেখে খনার বচন স্মরণ করে যে আশা জেগেছিল বিকেলে তা পূর্ণ হ'ল। মধ্য কলকাতার কোন এক বাড়ির ছাদ থেকে বিরাটের বেগ-মূর্তির সেই মোহনভয়াল আবির্ভাব দেখলাম। প্রথমেই বায়ুকোণের জনপদ প্রান্তরের সমস্ত ধুলোর রাশ লুণ্ঠন করে এনে এই নগরের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কোন মহাশিল্পী যেন পলকে ছবি আঁকার কি ভোজবাজি দেখিয়ে দিলে! আকাশের চোখে সত্যিই ধুলো দিয়ে এই নীরস ইটকাঠের অরণ্যকে বানিয়ে তুললে আশ্চর্য কোনো জল-রঙা তুলির কাজ। তারপর সেই ছবিতেও সন্তুষ্ট না হয়ে জলের ছাটে তাকে ধুয়ে ফেলবার খেপামিতে মত্ত হয়ে উঠল।

কালবৈশাখীর বাহনে নগরে প্রথম বৃষ্টির এই আবির্ভাব আমরা কতজনে দেখেছি বলা যায় না, কিন্তু খবরের কাগজে

তার বিবরণ সাগ্রহে বোধহয় সবাই পড়েছি। এ ঝড় সম্বন্ধে অজানা আমাদের কিছু নেই।

দমদমে যে তার বেগ ছিল ঘণ্টায় পঁইষট্টি মাইল, আর আলিপুরে পৌঁছোতে তা যে ক্লান্তিতে ছেচল্লিশে নেমে এসেছিল, দমদমে ১'৪৭ ইঞ্চি জল ঢেলে দেউলে মেঘের পাল যে আলিপুরের জন্যে ০'৩৯ ইঞ্চির বেশী বাঁচিয়ে আনতে পারেনি, তার লীলাখেলা যে মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিটের, তবে তারই মধ্যে দারুণ দগ্ধ দিনের তাপ সে যে ১৮° ডিগ্রী নীচে নামিয়ে দিয়েছিল, ইত্যাদি সব খবরই বোধ হয় আমাদের অনেকের মুখস্থ।

বৃষ্টির প্রতীক্ষা ও প্রার্থনা এখন খবরের কাগজের খোরাক হয়ে উঠেছে। এবারে একটু বেশী। কারণ, জানা গিয়েছে যে, যত বয়সই হোক, জীবিতদের মধ্যে জন্মে কেঁউ কখন চৈত্র-বৈশাখের এমন গরম নাকি দেখেন নি। চৈত্রের মাঝামাঝি থেকে তাপমাত্রা কবে কতখানি ছিল সাধারণ তাপমাত্রার চেয়ে তা কোনদিন কতটা বেশী, কবে তাপমান যন্ত্রের পারা এক শ' দশ ডিগ্রীরও ওপরে আরোহণ করে আগেকার সমস্ত পারদ-কীর্তি ম্লান করে দিয়েছে, সংবাদপত্রে সাগ্রহে এসব তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি।

বলতে পারি, মন্দ কি। আবহাওয়া মানে তো আকাশ-বাতাসেরই খবর। সে খবর কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় সসম্মানে যে আজকাল আসন পাচ্ছে, এটা আশার কথাই ভাবা যেতে পারে। কিন্তু মনের কোথায় একটা আশঙ্কা

সেই সঙ্গে যেন উঁকি না মেরে পারে না। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রাধান্য পেয়ে আকাশ-বাতাস আমাদের কাছে কি খবরই হয়ে উঠছে ক্রমশ! কাগজের আবহাওয়া-সংবাদ পড়ার আগ্রহে ও অভ্যাসে আকাশে চোখ তোলার উৎসাহ ও অবসর কি আর আমাদের নেই! খবরের কাগজ বড় হ'তে হ'তে আমাদের চোখের ও মনের দিগন্তও কি আড়াল করে দিলে?

অস্বীকার ক'রে লাভ নেই, সত্যিই দিয়েছে বা দিতে বসেছে। সকালের খবরের কাগজ আমাদের সমস্ত জীবনের উপরই যেন বিস্তৃত। আমরা শুধু সংবাদের উপকরণ, সাহিত্যের উপাদান তাই আর নই। যে ঝড়ের বেগ আমরা নির্ভুলভাবে জানি মনে তার দোলা আর তেমন করে লাগে কই? ইঞ্চির মাপে হিসেব করা বৃষ্টি অন্তরকে স্নিগ্ধ করে যায় না।

তাই মনে হয় খবর জানতে গিয়ে বাঁচতে আমরা বুঝি ভুলে যাচ্ছি। বুদ্ধির উর্ধ্বশ্বাস দৌড়ে অনুভবের বিশ্রামের আর সময় নেই।

কোনো সৌভাগ্যই অবিমিশ্র নয়। অতীতের নামে সজল চোখে দীর্ঘশ্বাস যারা ফেলেন, আমি তাদের দলে নেই। অবকাশ ছিল বলেই বাঁচার বিশুদ্ধ তীব্রতা সেকালে সহজ ছিল একথা মনে করার চেয়ে ভুল কিছু হতে পারে না। সমবেত বুদ্ধি খাটিয়ে বাঁচার এমন অনেক বিড়ম্বনা আমরা কাটিয়ে উঠছি, সেকালে শতকরা নিরানব্বুই জনের জীবনই যাতে পঙ্গু হয়ে থাকত। সেই শতকরা নিরানব্বুই জনকে

বিড়ম্বনামুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যের স্বর্গে এখনও আমরা পৌঁছে দিতে অবশ্য পারিনি। কিন্তু বুদ্ধির দিগ্বিজয়-যাত্রার নিশানে অন্তত সেই লক্ষ্যের আশ্বাসই আন্দোলিত।

লক্ষ্যে হয়তো আমরা একদিন পৌঁছোব, কিন্তু তারপর? সেই তারপর সম্বন্ধে মাঝপথেই কারুর কারুর মনে যে সংশয় জাগছে তা নেহাৎ অমূলক কি? তখন যেখানে ছিল বিড়ম্বনা, সেখানে এখন বিন্যাস-ব্যবস্থার বাঁধা ছক। বাঁধা ছকে নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি, বাঁধা রাস্তায় নির্বিঘ্ন মসৃণ গড়িয়ে যাওয়া, কিন্তু তাতে বেঁচে থাকার কতখানি পূর্ণতা বা গভীরতা, সব চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের আর সবার বেশী বাঁধা ছকের দেশগুলির দিকে চাইলেই তার আভাস বুঝি পাওয়া যায়।

সব চেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যের দেশের সাধারণ মানুষের অন্তত টেলিভিশনের বাইরে দৃষ্টি নেই, রেডিওতে ছাড়া কান নেই, খবরের কাগজের খোরাকের পরও যেটুকু মনের ক্ষুধা থাকে 'কমিক' পড়েই তা তৃপ্ত।

শুধু স্বাচ্ছন্দ্যের দেশের দোষটাই বা ধরি কেন, সমস্ত দুনিয়াই তো এক পথের পথিক; কেউ একটু এগিয়ে কেউ সামান্য পিছিয়ে। শৃঙ্খলা বাড়ছে হয়তো, বাড়ছে স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা, শুধু ছোট হয়ে আসছে বুঝি মন, শেখানো বুলি আর ধরানো অভ্যাসের গাঁথা দেওয়ালে।

সেই ছোট মনের বায়না মেটাতে খবরের কাগজের পাতার সংখ্যা বাড়ছে, আর আসল নয়, নকল সাহিত্যের কাগজও যে ছোট হতে শুরু করেছে আকারে, এটাও লক্ষ্য

করার মতো। এ কাগজ অনায়াসে পকেটে ভরা যায়, এক হাতে পাতা উল্টে পড়া যায়। লেখাও তার চুটকি, ধৈর্যের পরীক্ষা করে না, পাঠকের বোধ-বিচারের ওপর দাবী তার সামান্যই।

এই ছোট মন যোগাতে সাহিত্যও নেমে এসেছে নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়-সেবার দালালীতে। স্বাচ্ছন্দ্যের দেশের বেশীর ভাগ কাগজ কি বই অসুস্থ আদিরসের কদর্য ইতরতায় খোলার অযোগ্য। সাহিত্যে আদিরস নিষিদ্ধ অবশ্যই নয়, সব দেশের প্রাচীন ও বলিষ্ঠ সাহিত্যে এ রসের যথাযোগ্য স্থান আছে ও থাকবে। কিন্তু আদির সঙ্গে অনাদি রস না মিশলে তা যে জঘন্য বিকার মাত্র, ছোট মনের ছোট বই কি কাগজ তা জানে না।

কে জানে, এই ছোট বই কি ছোট কাগজের দিনও হয়তো ফুরিয়ে আসছে। ছোট হ'তে হ'তে তা একদিন যাবে অদৃশ্য হয়ে। থাকবে শুধু সংবাদপত্র। থাকবে এবং বাড়বে, স্বাচ্ছন্দ্যের সভ্যতার বদ্ধজলে রঙীন ফুলের রাক্ষসী পানার মতো।

আপত্তি কি তাহলে স্বাচ্ছন্দ্যে, আপত্তি কি সমাজ ব্যবস্থার বিধি-বন্ধনে? স্পষ্ট করেই বলা ভালো, না তা নয়।

আপত্তি নয়, আশঙ্কা শুধু সেই স্বাচ্ছন্দ্য আর সেই বিধিবন্ধনের নিরাপদ আশ্রয় সম্বন্ধে যার বিনিময়ে সত্তার সমস্ত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে বাঁধাবুলির তোতাপাখি ও ছকা চলনের কলের পুতুল হয়ে থাকতে হয়।

প্রাণ নিয়ে প্রকৃতি ঠাকরুণ এই পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য অদ্ভুত পরীক্ষাই করেছেন এ পর্যন্ত। সমষ্টি নিয়ে সমবায়ের খেলা তাঁর কাছে নতুন কিছু নয়। আমাদের এই দেহটাই তো অগুণতি কোষের একটা সমবায়-রাষ্ট্র। উই কি পিঁপড়ে কি মৌমাছির জগৎ তারই আরও উদার রকমফের। তাঁর সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা মানুষ নিয়ে। সে ঘরেরও নয় ঘাটেরও না। একদিকে সে সমাজ আর একদিকে ব্যক্তি, একদিকে কঠোর কর্তব্য আর একদিকে আত্মসার জীবন বিলাস ও জিজ্ঞাসা। এই দুই তালের বিষম ছন্দেই তার ইতিহাসের এগিয়ে চলা। এর একটা তাল কাটলেই সব পরীক্ষা পণ্ড।

দেখে শুনে সন্দেহ হয়, একটা তাল বুঝি কাটছে। সভ্য হয়ে স্বাচ্ছন্দ্য কেনবার দাম দিতে গিয়ে মানুষ হওয়ার ভয়ঙ্কর গৌরবই আমরা বুঝি বন্ধক দিতে বসেছি। পতঙ্গ কি পশুরা না হয় সহজাত সংস্কারের সুতোয় বাঁধা কলের বেশী কিছু নয়, কিন্তু জানবার বোঝবার এবং তারো চেয়ে যা বেশী সেই বাঁচবার অবাধ সনদ পেয়েও শুধু নিরাপদ নিশ্চিন্ত হবার মিথ্যা লোভে তা যদি হারাই তার চেয়ে আফসোসের কিছু নেই।

আবার বুঝি উল্টো বোঝার ভয়। তবে কি চাই—সেই আদিম অরণ্যে ফিরে যেতে, ফিরে যেতে সেই সুস্থ দুরন্ত বর্বরতায়! চাইতাম, যদি বর্বরতা সত্যিই হ'তো সুস্থ। কিন্তু না তা দুরন্ত না সুস্থ। চারিধারে তার ভয়ের বেড়া, মনে

তার আষ্টেপৃষ্ঠে অন্ধকারের বেড়ি। শুধু তার বন্যতার সারল্যটুকুরই যা দাম। তাই তার বদলে সভ্যতাকেই, আদিম নয়, বেড়াবেড়িভাঙা শোধিত বর্বরতা দিয়ে মাঝে মাঝে সজীব করে নিতে হ'বে, কলমের গাছকে যেমন সফল করি বন্যতার বেগ মিশিয়ে।

স্বাচ্ছন্দ্যে অরুচি নেই, বিড়ম্বনা যত ঘোচে ঘুচুক, কিন্তু তার জন্যে সব জানা ও বোঝার ওপরে সার্থক বাঁচার গূঢ় রহস্য খবরের কাগজের তলায় চাপা দিয়ে না হারিয়ে ফেলি।

কোনো এক শতাব্দীর দারুমণ্ডের সভ্যতায় নাই বা রইলাম সুসংবাদরূপে আমরা মুদ্রিত ; তার চেয়ে মহাকালের ব্যর্থ জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল জীবন-পিপাসা হয়েই যদি লুপ্ত হয়ে যেতে হয়, তাই যাব।

সাহিত্যের উপকরণ

গত যুদ্ধের সময়ের কথা।

আর কিছুর না হোক রেলস্টেশন গুলোর চেহারা তখন একেবারে বদলে গিয়েছে।

প্ল্যাটফর্মে তিল ধারণের জায়গা কোনো সময়েই মেলে না —চারিদিকে শুধু নানা ধরনের নানা জাতের সামরিক পোষাকের মেলা। সাধারণ দেশী পোষাক তার মধ্যে যেন বিসদৃশ ছন্দোপতন।

খড়গপুর জংশন স্টেশনে এই সময়ে মাঝে মাঝে গাড়ি-বদলের জন্যে আমায় রাত কাটাতে হয়েছিল।

রাত্রেও স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সমান ভিড়।

ওয়েটিং-রুমে জায়গা পাওয়া তো আশাতীত সৌভাগ্য। উত্তম-মধ্যম সকল শ্রেণীর ঘরেই সবুজে-খাকীর একাধিপত্য। কোনোরকমে প্ল্যাটফর্মের ওপর একটু বসবার জায়গা পেলেই তখন ধন্য।

বোমারু বিমানের ভয়ে সমস্ত বাতির মুখেই বোরখা পরানো। প্ল্যাটফর্মের অধিকাংশ জায়গাতেই তাই একটা আবছা তরল অন্ধকার।

সে অন্ধকারে মানুষকে মানুষ বলে বোঝা যায়, চেনা যায় না।

সৌভাগ্যক্রমে সে-রাত্রে প্ল্যাটফর্মের একধারে রাখা ক'টা

প্যাকিং কেসের বাক্সের ওপর একটু বসবার জায়গা পেয়েছিলাম। আশে-পাশে যতদূর দেখা যায়, পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে আরো বহু যাত্রী যে যতটুকু পেরেছে, প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপরেই জায়গা করে নিয়ে বসেছে। আমারই আসন তার মধ্যে একটু উঁচু।

একটু বুঝি ঢুলছিলাম। বিরক্ত হয়ে নিদ্রাজড়িত চোখ খুলে তাকালাম। একটা বিশাল কাপড়ের বস্তা যেন আমায় কি বলছে।

ঘুমের জড়তা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম কাপড়ের বস্তার সঙ্গে জড়ান একটা মানুষও আছে।

ভাষার টানটা বিশেষ কোনো আঞ্চলিক। কিন্তু বক্তব্যটা বোঝা কষ্টসাধ্য নয়। আমার পাশে একটু জায়গা হবে বসবার?

জায়গা দিলাম। যেখানটায় বসেছিলাম, সেখানটা একটু বেশী অন্ধকার। কেউ কাউকে ভালো করে দেখতেই পাই না। নিজেদের তৈরী কৃত্রিম ব্যবধানগুলো অন্ধকারেই উহ্য হয়ে থাকায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আলাপ জমে উঠল।

আলাপ বেশীরভাগ একতরফা।

আমি শ্রোতা মাত্র। কথার সূত্র ছিঁড়ে না যায়, তাই মাঝে মাঝে একটু ফোড়ন দিই শুধু।

বক্তা, কাটা কাপড়ের ফেরিওয়ালা। সস্তা রকম-বেরকমের ছিটের জামা-সেমিজ ফ্রক-ব্লাউজ তৈরী করে তাদের গাঁয়ের বাড়িতে, তারপর পিঠে বোঁচকা বেঁধে তাই বিক্রি করতে নিয়ে যায় ট্রেনে করে দূর-দূরান্তরের হাটে-বাজারে-মেলায়।

কাটা কাপড় বিক্রির মধ্যে এত রহস্য, এত মজা, এত বৈচিত্র্য, এত ফন্দি-ফিকিরের মার-প্যাঁচ, এত সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য জড়ানো অফুরন্ত গল্প আছে, কে জানতো ?

হঠাৎ আশপাশের প্ল্যাটফর্মে অন্ধকারে অস্পষ্ট স্তূপীকৃত মানুষের জটলার ওপর চোখ পড়ল। এই প্ল্যাটফর্মের ওপরেই কত আশ্চর্য গল্প, কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, কত অজানা জীবনের রহস্য প্রতিটি মানুষের মধ্যে অনুচ্চারিত হয়ে রয়েছে।

এই অনুচ্চারিত জীবন-সমষ্টিকে ভাষা দিয়ে চিরকালের জন্যে সঞ্চয় করে রাখা সাহিত্যেরই একটা দায়িত্ব নয় কি ?

কিন্তু এই অপর্যাপ্ত উপকরণের কতটুকু আমাদের সাহিত্যে জায়গা পেয়েছে ?

আপাতত আমার সামনে এখনকার একটি স্বনামধন্য সাময়িক সাহিত্য-পত্রিকা পড়ে রয়েছে। পাতা ওল্টাতে তার ভেতরকার বই-এর বিজ্ঞাপনগুলি লক্ষ্য করে দেখছি।

এই বিজ্ঞাপনগুলি থেকেই বর্তমানে বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের একটা পরিচয় বোধ হয় পাওয়া যেতে পারে।

সমস্ত পত্রিকাটিতে কিন্তু উপন্যাস, গল্প ও একটি-দুটি কবিতার ও প্রবন্ধের বই ছাড়া একটা ভ্রমণ-কাহিনীর নামও পাচ্ছি না।

এবারে না হোক, পরবর্তী সংখ্যায় কেদার-বদ্রী কি দাক্ষিণাত্য যাত্রীর একটা-আধটা ভ্রমণ-কাহিনীর নাম হয়তো

পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাধারণত বাঙলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যের দৌড় ওই পর্যন্ত গিয়েই শেষ।

স্বীকার করছি যে গল্প উপন্যাসে বিষয় ও পরিবেশের বৈচিত্র্য আনবার একটা সচেতন এবং ঘর্মাক্ত চেষ্টা অনেকদিন ধরে চলেছে। উত্তম থেকে তথাকথিত অধম পর্যন্ত নানা স্তরে কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহের একটা উৎসাহ সংক্রামকভাবে অনুভবও করছি কিছুদিন। কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এ উৎসাহটা কৃত্রিম এবং সংগৃহীত উপকরণও তাই বেশীরভাগ ভেজাল।

বাঙলা সাহিত্যের এই দৈন্যের সাফাই গাইতে বাঙালীর জীবনের বৈচিত্র্যের অভাবের কাঁদুনি গাওয়াটা উচিত বলে আমার মনে হয় না। জাতিগত হিসাবে ইংরেজের তুলনায় আমাদের জীবনে বৈচিত্র্যের সুযোগ হয়তো কয়েকটি দিকে সীমাবদ্ধ, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও তো সত্য যে, জাতি হিসেবে আমাদের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতার সামান্য একটু ভগ্নাংশ ছাড়া সাহিত্যের আলোয় এখনো তুলে ধরা হয়নি। খড়গপুর স্টেশনের সেই প্ল্যাটফর্মের জনতার মতো তা এখনো অন্ধকারেই নির্বাক হয়ে আছে।

সাহিত্যের সত্যকার সার্থকতা উপকরণের প্রাচুর্য বা বৈচিত্র্যের ওপর অবশ্য নির্ভর করে না, কিন্তু দেশ ও কালের মনের মুকুর হবার সাধ যে সাহিত্যের আছে, তার আলো যতদূর সম্ভব ছড়িয়ে পড়তে পারে, এমন উজ্জ্বল করে জ্বালা উচিত নয় কি?

হোলি

পৃথিবীব্যাপী একটা বিরাট মহাযুদ্ধের দাবানল থেকে ছিটকে পড়া আগুনের টুকরো এখনো আমাদের ঘরের আনাচে কানাচে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলছে, একটা নিদারুণ দুর্ভিক্ষের অভিশাপ এখনো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি, একটা অমানুষিক দাঙ্গায় এখনো সমস্ত দেশ জর্জর, তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন কালবৈশাখীর ঝড়ে শহরের রাজপথের যত বন্দী গাছ তাদের জীর্ণ পাতা উন্মাদের মতো আকাশে উড়িয়ে দিয়ে বসন্তের আগমনী ঘোষণা করলে।

বন্দী গাছের বসন্ত-উন্মাদনা তারপর শহরের মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে যেতে দেখলাম। এল হোলির দিন। সমস্ত শহরে যেন রঙের আগুন লেগে গেল।

এই রঙের আগুন জ্বলে ওঠার মধ্যে শীতের শাসন ভাঙা প্রাণের একটা স্বতস্ফূর্ত সুস্থ বিদ্রোহ আছে ভাবতে ভালো লাগে। ভাবতে ভালো লাগে যে পিচকারির জলের ধারার মতো উৎক্ষিপ্ত যৌবনের এই উদ্দাম উল্লাস এমন গভীর একটা প্রাণের প্রাচুর্যময় উৎস থেকে উঠে আসছে, কোনো দুঃখ কোনো আঘাত কোনো সাময়িক দুর্ভাগ্যের অভিশাপ যাকে শুকিয়ে দিতে পারে নি। মহাগুরুনিপাতে শোকাচ্ছন্ন সমস্ত দেশ যখন অশৌচ পালন করছে, জননায়কেরা যখন সকল রকম আনন্দ উৎসব বন্ধ রাখার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন, উত্তাল

যৌবন তখন যেন সমস্ত কৃত্রিম বাহ্যিক বিধি নিষেধ হেলায় ভেঙে ফেলে জীবনের উচ্ছ্বাস দিয়েই মহান মৃত্যুর সত্যকার সম্মান রাখতে চেয়েছে—এই কথাই ভাবতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু হোলির দিন শহরের রাজপথে বার হবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যাদের হয়েছে, একথা ভাবা বুঝি তাদের পক্ষে একটু কঠিন। শহরের রাজপথে যে তাণ্ডব লীলা সেদিন দেখা গিয়েছে তাকে উচ্ছল যৌবনের বাঁধভাঙা আকস্মিক বন্যা বলে কিছুতেই যেন ভুল করা যায় না।

শহর হিসেবে কলকাতার বয়স এখন কাঁচাই বলা যায়। দশ বিশ হাত মাটির নীচে তার ভিৎ আর নামে নি। কিন্তু গত কয়েক বছর যে সব নিদারুণ অভিজ্ঞতা তার হয়েছে তাতে মানুষ হ'লে চুল পেকে বুড়িয়ে যাওয়ার কথা। নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে সভয়ে রাতের পর রাত তাকে লুকিয়ে কাটাতে হয়েছে। তারই মধ্যে অকস্মাৎ 'সাইরেন'-এর আর্তনাদে বিদীর্ণ আকাশ থেকে নেমেছে বোমার বৃষ্টি। বিধাতার অভিশাপে নয় মানুষেরই কারসাজিতে প্রতারিত দূরদূরান্তের মানুষেরা তার রাজপথে নিজেদের কঙ্কালগুলি বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছে। তারপর সেই রাজপথকে শুচি করবার জন্যেই বুঝি মানুষের রক্তে তা ধুতে হয়েছে। এ সমস্ত নিদারুণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সেদিনকার হোলি উৎসবের স্মৃতিও স্থান পাবার অযোগ্য নয়।

সভ্যতা ও ভব্যতা শ্লীলতা ও শোভনতার সমস্ত সীমা হেলায় লঙ্ঘন করে যারা সেদিন শহরের রাজপথে মাতামাতি

করেছে রং ও ততোধিক উৎকট ঢং-এর দরুণ তাদের চিনতে প্রথমটায় ভুল হওয়া কিছু আশ্চর্য ছিল না। অনায়াসেই মনে করা যেত কোনো গারদের দরজা ভেঙে দুর্দান্ত কয়েদীর দল দুঃস্বপ্নের মতো নগরের পথে বুঝি ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের রঙ খেলার মধ্যে প্রাণের সুস্থ সবল উচ্ছলতা তো দেখা যায় নি, দেখা গিয়েছে শুধু অসুস্থ মনের উচ্ছৃঙ্খল ঔদ্ধত্য। তারা পিচকারি ছুড়েছে সোডার বোতল বা অ্যাসিড বাল্‌ব ছুড়ে মারার মতো, পাকা টোম্যাটো বা কুঙ্কুম ছুড়ে মেড়েছে দূর থেকে ঢিলের মতো, দলে ভারী থাকলে নির্বিচারে রাস্তার অসহায় স্ত্রী পুরুষকে লাঞ্ছিত করেছে নীচ কাপুরুষের মতো, অপরিচিত মেয়েদের স্পর্শ করবার সুযোগ নিয়েছে নীচ ভীরু লম্পটের মতো। তারা আবীর মাখিয়েছে অন্তরের প্রীতি থেকে নয়, যেন গায়ের ঝাল মেটাবার অক্ষম আক্রোশে। দরিদ্র মধ্যবিত্ত বা ধনী কোনো ভদ্র পরিবারের সঙ্গে এদের কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয়নি। মনে হয়েছে এরা ভুঁই-ফোড়—নিজেদের জননী বা ভগিনীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বলেই যেন কোনো সম্পর্কের ধার এরা ধারে না।

সত্যিই ছদ্মবেশে থাকলেও এদের জেল-ভাঙা কয়েদী ভাবার ভ্রান্তি দুঃখের বিষয় বেশীক্ষণ বজায় রাখা যায় না। খানিকক্ষণের মধ্যেই এই ভয়ঙ্কর সত্য আবিষ্কার করে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয় যে এরা আমাদেরই ভবিষ্যতের আশা ভরসা, দেশের অমূল্য যৌবন।

এই অমূল্য যৌবনের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় আমাদের

ইদানিং হয়নি এমন নয়,—এরা নির্ভীক বেপরোয়া। পরীক্ষায় প্রশ্ন কঠিন হলে এরা খাতা ছিঁড়ে কালির দোয়াত উল্টে সব লণ্ডভণ্ড করে স্কুল থেকে বেরিয়ে আসে, মাস্টার নম্বর কম দিলে তাকে অপমান করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না, ট্রামে বাসে দল বেঁধে উঠলে ভাড়া না দেওয়া বাহাদুরী মনে করে। এরা স্বাধীনতার প্রতীক, তাই কোনো মাত্রা এরা জানে না, কোনো দায় মানে না।

দেশের স্তিমিত যৌবনকে উসকে দিয়ে জাগাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন অনেক কিছু করে গিয়েছেন। কিন্তু 'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা, সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা' যিনি লিখেছিলেন হোলির দিনের এই প্রমত্ত প্রমথদের মধ্যে নিজের কবিতার এই পরিণতি দেখলে তিনি বোধহয় লজ্জায় অধোবদন হতেন। অবশ্য তাঁর লজ্জা পাবার কোনো কারণ নেই। কারণ এরা প্রমত্ত বটে কিন্তু হৃদয় মনের যে বর্ণাঢ্য বিস্তার-সৌষ্ঠবকে পুচ্ছ বলে তিনি বর্ণনা করেছেন তার কোনো বালাই এদের নেই। তাছাড়া নাচাবার কথা এদের মানসিক পরিধির বাইরে! যে কোনো রকমের নাচই হোক তাকে ছন্দের মধ্যে সংযত হতে হয়। কথায় কথায় জয়হিন্দ চিৎকার করা যেমন দেশপ্রেম নয়, মৃগী রোগীর হাত পা খিঁচুনি বা মাতালের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেসামাল আস্ফালন তেমনি নাচ নয়।

আসল কথা যৌবনের জয়গান করতে করতে যৌবনের সত্যিকার মানে প্রায় আমরা ভুলতে বসেছি। মহাকবিদের

যৌবন-প্রশস্তি পড়ে যদি এই ধারণা আমাদের হয়ে থাকে যে যৌবন মানে এমন একটা উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, যার হ্রস্বদীর্ঘ অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান নেই এবং কোনো সংযম কোনো দায়িত্বের ধার যা ধারে না, তাহলে সত্যিই আমাদের দুর্ভাগ্য। সত্যিকার যৌবনের সংহত শক্তির সঙ্গে যাদের কোনোদিন পরিচয় হয়নি যৌবন সম্বন্ধে এই মিথ্যা কিংবদন্তী তারাই রটনা করে এসেছে।

যৌবন বেপরোয়া, যৌবন বেহিসাবী বাউণ্ডুলে বিদ্রোহী এই কথাই যারা শোনায় যৌবন সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণাই নেই। জীবনের সমস্ত গুরুভার যৌবনই যে বহন করে, দুর্বার শক্তি ও দুরন্ত দুঃসাহস কঠিনতম সংযমে বাঁধা না থাকলে যৌবন যে সত্য হয়ে ওঠে না, একথা তারা জানে না। শিশু আপনা থেকে উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে। বৃদ্ধের পক্ষে বিশৃঙ্খল হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু যৌবনের প্রচণ্ড বেগ শুধু শৃঙ্খল ও শাসনের মধ্যেই সার্থক। যৌবন তাই বেপরোয়া হতে পারে কিন্তু বেসামাল কখনো নয়। যৌবন দুঃসাহসী সন্দেহ নেই কিন্তু দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য একেবারেই নয়। অকূল সাগরে তুফানের বিরুদ্ধে সে পাড়ি দেয় কিন্তু স্থির লক্ষ্যের দিকে বজ্রমুষ্টিতে হাল একমাত্র সেই ধরে রাখে। যৌবন বেহিসাবী নিশ্চয়ই কিন্তু সে শুধু তার হিসেব একটু আলাদা বলে। ছোট লাভের নিরাপদ গণ্ডির মধ্যে সে থাকতে চায় না, বড় লাভের জন্যে সর্বস্ব পণ করার সাহস সে রাখে। যৌবন বিদ্রোহী কিন্তু তার বিদ্রোহ নিয়ম শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে নয়, অনিয়ম অন্যায় অবিচার অত্যাচার যেখানে বিরাট বিশৃঙ্খলা-

রূপে দেখা দেয় যৌবন সেইখানেই শৃঙ্খলা আনবার জন্যে বিদ্রোহ করে।

শহরের রাজপথে যে উন্মত্ত তাণ্ডব সেদিন দেখা গিয়েছে যৌবনের পক্ষে তা সম্ভব বলে তাই মনে হয় না। বিকৃত বাতুল বার্ধক্যই অমন ভাবে বেসামাল বেলেল্লাগিরি করতে পারে। তাদের যে ছদ্মবেশের কথা আগে বলেছি সে আবরণের আড়ালে যা আছে তা সুস্থ যৌবন বা সৌম্য বার্ধক্য নয়, আছে কুৎসিৎ অকাল-বার্ধক্য। উৎসবকে যারা উৎপাত করে তুলেছে সেই অকাল-বৃদ্ধের দলই আমাদের ভবিষ্যতের আশা ভরসা আমাদের দেশের একমাত্র সম্বল একথা তাই ভাবতে পারি না। সুস্থ সবল পরিবারেও ভাগ্যের অভিশাপে বিকৃত বিকলাঙ্গ সন্তান কখনো কখনো জন্মায়। যে নিদারুণ বিপর্যয় আমাদের ওপর দিয়ে গিয়েছে, উৎপীড়িত উৎকণ্ঠিত দেশ তারই মধ্যে বুঝি সব হতভাগ্যদের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এরাই দেশের সব নয়। সত্যকার যৌবন এদেশে এখনো আছে বলে বিশ্বাস করি। যৌবনের নামে যারা কলঙ্কলেপন করে, সেই বিকৃত অকাল-বৃদ্ধদের শিক্ষা দেবার ভার তাই এদেরই ওপরে।

সভা ও সাহিত্য

সেবার এক সাহিত্য-সভার নিমন্ত্রণে টাটানগরে গিয়েছিলাম।

টাটানগরের সঙ্গে সাহিত্য কথাটা শুনলে কানে প্রথমটা হয়তো একটু খটকা লাগতে পারে। কোথায় লোহা কয়লা আগুন আর কোথায় মানুষের মনের সূক্ষ্ম কারুকাজ—দুই-এর যেন সতাসতীন সম্পর্ক বলেই অনেকের বোধ হয় ধারণা। আমি কিন্তু সত্যিই তাদের দলের নয়। টাটানগর সত্যিকার সাহিত্যজগতের বাইরে তো নয়ই বরং তার আশ্চর্য এক বিষয়বস্তু কি বিরাট বিচিত্র তার উপাখ্যান। ক্ষুদ্র জনপদ থেকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক নিয়মে তা বড় হয়ে ওঠেনি। জনহীন রুক্ষ পার্বত্য প্রান্তর থেকে যেন আলাদিনের প্রদীপের স্পর্শে তা অকস্মাৎ জেগে উঠেছে। এখানে আলাদিনের প্রদীপ কিন্তু কোনো অলৌকিক বস্তু নয়, সে প্রদীপ মানুষের সীমাহীন দুরাশা, তার অদম্য কৌতূহল, সত্যের সন্ধানে তার বিচিত্র অক্লান্ত অভিযান, তার অপরিসীম ধৈর্য ও কর্মশক্তি। মানুষের কর্মযোগের মহিমান্বিত রূপ এই নগরের মধ্যে প্রতিবিম্বিত। বৈজ্ঞানিকের ধ্যান, শ্রমিকের পেশিবল্ল, শিল্পপতির দুঃসাহসিক কল্পনা (আর কাঞ্চন-প্রীতিও নিশ্চয়)

বহু সাধকের বহু কর্মির অবিচলিত সাধনা ও সহযোগিতা এই নগরের ভিত্তির সঙ্গে মিশে আছে।

এই নগরে সাহিত্যসভা আহ্বান করার মধ্যে একটা বিশেষ ইঙ্গিত আছে মনে হয়। কঠিন বাস্তব সত্যের ওপর এ নগর প্রতিষ্ঠিত। শুধু আকাশচারী অলসস্বপ্ন নয়, জীবনের সর্বগ্রাসী প্রয়োজনে প্রকৃতির বদ্ধমুষ্টি থেকে তার গোপন রহস্য উদ্ধার করে প্রয়োগ করার সাধনাই এ নগরের প্রাণবস্তু। এ সাধনায় ফাঁকি চলে না, রূঢ় সত্যের সঙ্গে প্রতি পদে নির্মম সাক্ষাতের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হয়। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের সঙ্গে কোনো মিথ্যা রফা কোনো চাতুরী চলে না।

এখানে সাহিত্য-সভা আহ্বানের মধ্যে সাহিত্যকে মোহ ও সংস্কারমুক্ত মনে জীবনের সমস্ত সত্যের সম্মুখীন হতে বলার ইঙ্গিত যদি থাকে তাহলে এ সভা সত্যিই সার্থক বলে আমি মনে করবো।

সত্যি কথা স্বীকার করতে কি, সাধারণ সাহিত্য-সভার হুজুগের প্রতি শ্রদ্ধা আমার কোনোকালেই খুব বেশী ছিল না, এখনও নেই। আমার নিজের ধারণা এই যে, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক থেকে শুধু নৈতিক পর্যন্ত নানারকম সভার যে সার্থকতাই থাক, সাহিত্য ঠিক সভা করে হুজুগ করবার বস্তু নয়। সাহিত্যের সহজ আড্ডা হতে পারে কিন্তু সভার কৃত্রিম পোশাকী আড়ষ্টতা তার ঠিক ধাতস্থ নয়।

আমার ধারণা হয় তো ভুল। তা যদি হয় তাহলে বলবো,

বাংলা দেশের সাহিত্য-সভার অত্যধিক বাহুল্যই আমার মনকে সাহিত্য-সভার প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। বাঙালী তার সাহিত্য নিয়ে গর্ব করতে পারে বটে, কিন্তু তার সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় সাধারণত সাহিত্য-সভার বাইরে খুব বেশী পাওয়া যায় না। আমার তো মনে হয় বাঙালীর মতো কথায় কথায় এত বেশী সাহিত্য-সভা আর কোনো জাতি বা দেশ করে না। বাঙালী সাহিত্য-সভা যত বেশী করে, বই কেনে ও পড়ে সেই অনুপাতে সবচেয়ে কম এবং সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের ক্ষোভটা সেইখানে। বাঙালী সাহিত্য-সভায় যে উৎসাহ প্রকাশ করে তার অর্ধেক যদি বই পড়ায় এবং কেনায় দেখাতো তাহলে আমার মতো আরো অনেক হতভাগ্য সাহিত্যিককে সিনেমা বা তদনুরূপ কিছুর অনুগ্রহপ্রার্থী বোধ হয় হ'তে হতো না।

কিন্তু শুধু নিজের কাঁদুনি গাইবার জন্যেই সাহিত্যসভার সার্থকতা সম্বন্ধে এ প্রশ্ন তুলি নি। সভা করে যে সাহিত্য হয় না সে কথা সকলেই নিশ্চয় মানেন। তাতেও কিছু আসতো যেতো না যদি সাহিত্যিকেরা সভা করে কিছু করতে পারেন কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহের কারণ না থাকতো।

সাহিত্যিকরা সভা করে কিছু করতে পেরেছেন ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত আছে বলে মনে হয় না। অতীতকালের কথা ছেড়ে দিলাম, আধুনিক কালে সাহিত্যিকদের সভাসদরূপে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার একটি প্রচেষ্টা আমাদের চোখের ওপরই ব্যর্থ

হ'তে দেখেছি। P. E. N. club-এর নাম কারুর অজানা বোধ হয় নয়। পরলোকগত H. G. Wells এই আন্তর্জাতিক সভাটি অনেক আশা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সভায় সাহিত্যিক ছাড়া শিল্পীদেরও স্থান ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সভার হাঁক ডাক খুব বেশী শোনা গিয়েছিল এবং মনে হয়েছিল, বিশ্বের কল্যাণ ও মৈত্রীর ব্যাপারে এ সভার প্রভাব প্রতিপত্তি বুঝি কিছু আছে। কিন্তু যুদ্ধের কিছু আগে আর্জেণ্টাইনের P. E. N. সভার অধিবেশনে সাহিত্যিক শিল্পীদের এ দিবাস্বপ্ন নির্মমভাবে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। তখন পাশ্চাত্য জগৎ ফাসিস্ট কমিউনিস্ট ও ডেমোক্র্যাটিক গোয়ালে ভাগ হয়ে গিয়েছে। দেশকালের উর্ধ্বে যাঁদের থাকবার কথা, দেখা গেল সেই সাহিত্যিক শিল্পীরাও নিজের নিজের খোঁয়াড়ে নাম লিখিয়ে পরস্পরের প্রতি শিং বাগিয়ে বসে আছেন। আর্জেণ্টাইনের সাহিত্য সভা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের মুষ্টিযুদ্ধের আসরে পরিণত হবার উপক্রম হয়ে ভেঙে যায়। সাহিত্যিকদের যে স্বরূপ সেখানে দেখা যায় তাতে তাঁদের সাহিত্যিক না বলে স্তাবক বলাই বোধ হয় উচিত।

সাহিত্যিকেরা অবশ্য অল্পবিস্তর চিরকালই স্তাবক বা মোসাহেব জাতীয় ছিলেন বললে, খুব বোধ হয় মিথ্যা বলা হয় না। আগে তাঁরা প্রবলের অর্থাৎ রাজা বা বিজয়ী দস্যুর স্তাবকতা করতেন এখন করেন—ideaর নামে—ism-এর।

Ism-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে আমরা 'বাদ' কথাটা

ব্যবহার করি, যেমন সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, ফাশিস্টবাদ ইত্যাদি। এ শব্দচয়নের ভেতর নিজেদের অজ্ঞাতসারে কতখানি সত্যের স্পর্শ যে আমরা রেখেছি তা বোধ হয় আমরা নিজেরাই জানি না। সমগ্র জীবনের বিচার বিশ্লেষণ জিজ্ঞাসা যখন আমরা কোনো 'বাদ'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিই তখন জীবনের অনেক কিছু সত্যিই বাদ পড়ে যায়। বাদ-মার্কা সাহিত্য তাই বিবাদের সাহিত্যের বেশী কিছু ওপরে ওঠে না।

স্তাবকতাই সাহিত্যের প্রধান দুর্বলতা হ'লেও সেই দুর্বলতাই কখনো কখনো তার মুক্তির পথ খুলে দেয়। স্তাবকতা নিজের অজ্ঞাতসারে কোনোদিন সত্যকার স্তব হয়ে ওঠে, এবং সেই স্তব নিজের আন্তরিকতায় সত্যের সৌন্দর্যের মণিকোঠায় গিয়ে পৌঁছয়।

সাহিত্যের এই সত্য বস্তুটি কি তাই নিয়েও অবশ্য গণ্ডগোলের অবধি নেই। দলগত ism বা বাদ-প্রাধান্য নিয়ে লড়াই তো আছেই তার ওপর আছে সাময়িক ও চিরন্তন সত্য নিয়ে কলহ।

কিন্তু এ সমস্ত কলহ শুধু সাহিত্য-সভার কলহ। সত্যকার সাহিত্যিক শিল্পী যেখানে তাঁর সৃষ্টি নিয়ে তন্ময় সেখানে এই কলহ পৌঁছয় না। দলের লেবেল জীর্ণ পাতার মতো তাঁর অঙ্গ থেকে খসে যায়।

যুগে যুগে এমন বহু সাহিত্যিকের দেখা আমরা পেয়েছি, স্তাবককুলে জন্ম নিয়েও সময় ও পরিবেশের সমস্ত শৃঙ্খল ছিঁড়ে যাঁরা নিগূঢ় মনের সত্যের সন্ধান পেয়েছেন ও নির্ভয়ে

তা ঘোষণা করেছেন। আজকের বাদানুবাদের হট্টগোলে তাঁরা যতই উপেক্ষিত অপমানিত হ'ন, তাঁদের জ্যোতি চিরকাল অম্লান থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।

সময় ও পরিবেশের প্রভাবের কথা উল্লেখ সাহিত্যিকের সম্পূর্ণ অবজ্ঞার বস্তু একথা কিন্তু আমি বলতে চাই নি। বরং এই কথাই আমি বলি যে, নিজের সময় ও পরিবেশ সম্বন্ধে যিনি অজ্ঞ ও অচেতন সাহিত্যের সাধনা তাঁর ব্যর্থ। বর্তমান যাঁর চোখের ওপর নেই ভবিষ্যৎ তাঁর অন্ধকার।

কিন্তু সময় ও পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন থাকা এক কথা আর তারই বেষ্টনীতে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখা আর এক কথা।

এ প্রসঙ্গের গোড়ার দিকে জীবনের সমস্ত সত্যের সম্মুখীন হওয়ার সাহসের কথা বলেছি। যে সাহিত্য জাগ্রত যে সাহিত্য নির্ভীক তাকে বর্তমান কাল ও দেশের পরিধির মধ্যেই জীবনের বাস্তবতাকে প্রত্যক্ষ করতে হবে। আকাশে বিহার করে মৃত্তিকাকে অবজ্ঞা করা তার চলবে না।

কিন্তু সাহিত্যের সত্য তো বিজ্ঞানের সত্য নয়, আজ যা সামনে আছে সাহিত্য শুধু তারই খবর রাখে না, কাল যা হওয়া উচিত সাহিত্য তারই ধ্যানকে মূর্তি দেয় আজকের মানুষের জন্যে—সে মানুষ যত অন্ধ যত বধিরই হোক, সাহিত্য তার অন্ধতা ও বধিরতাকেই চরম সত্য বলে মেনে নীরব হয়ে থাকে না।

আমাদের চারিধারে আজ আমরা একটা বিরাট

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন দেখছি। মানুষের সমাজ-বিবর্তনের আলোড়ন। মানুষের সমাজ-বিবর্তনের পথে এক যুগের আদর্শ আর এক যুগে ম্লান হয়ে তার মূল্য হারায়, ছোট গণ্ডির মধ্যে যা সার্থক ছিল বৃহত্তর ক্ষেত্রে পড়ে তা নিরর্থক হয়ে পড়ে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়—মানব-সম্পর্কের বৃহত্তর স্থাপত্য ছোট ছোট আপাত স্বসম্পূর্ণ সমাজের ভাঙাচোরা উপকরণ থেকে নতুন করে গড়া হয়। এই বিবর্তন একদিনে শেষ হবার নয়—শেষ কখনও হয় না। আজ আমাদের সামনে সেই বিবর্তনের একটি উত্তাল উদ্বেল মুহূর্ত উপস্থিত। নানা খণ্ডস্রোত একত্র হয়ে যে আলোড়ন তুলছে তাতে জরাজীর্ণ প্রাচীন ও উৎসুক নূতন আদর্শ এমনভাবে মিশে আছে, খণ্ড সঙ্কীর্ণ অশুভ স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গে উদার মানব-কল্যাণের কল্পনা এমন ভাবে মৃত্যুপণ সংগ্রামে জড়িয়ে আছে যে অনেক সময়ে তাদের পৃথক করে নেওয়া কঠিন।

এইটুকু শুধু আমরা জানি যে, পৃথিবীর যে সমৃদ্ধিতে সমস্ত মানুষের জন্মগত সমান অধিকার তা বণ্টন করার বিরাট অসাম্য দূর না করলে মানবসমাজের ভবিষ্যৎ কল্যাণ নেই। দেহের প্রয়োজন ও ক্ষুধার দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবার মতো উপকরণ ও উপায় বিজ্ঞান মানুষের হাতে এখুনি তুলে দিয়েছে, কিন্তু মানুষ নিজের সঙ্কীর্ণ লোভে সে উপকরণ ও উপায় শোচনীয়ভাবে মূঢ়ের মতো অপব্যবহার করেছে।

সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই অবিচার ও বিশৃঙ্খলার প্রতি সত্যকার সাহিত্য উদাসীন থাকতে পারে

না, সমাজব্যবস্থার বিবর্তন ও পরিবর্তনে তার সায় ও স্বাক্ষর সর্বাগ্রে থাকতে বাধ্য কিন্তু তার কাজ শুধু ওইখানেই শেষ নয়। তা যদি হতো সাহিত্যের কোনো প্রয়োজনই থাকতো না।

পৃথিবীতে মানুষই শুধু একমাত্র সামাজিক জীব নয়, সমাজ নিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা আরো অন্য প্রাণীও করেছে। উইপোকা কি মৌমাছি কি পিঁপড়ের সমাজে যে ব্যবস্থা কায়েমী তাকে Communism না হোক তারই নিকট জ্ঞাতি অনায়াসেই বলা যায়। কিন্তু সেখানে সমাজ আছে ব্যক্তি নেই। মানুষের গৌরব ও মানুষের পরম দায় এই যে তাকে সমাজও গড়তে হয় কিন্তু ব্যক্তিকে বিসর্জন দিতে সে পারে না। তার সাধনা তাই অনেক বেশী দুরূহ এবং সেই দুরূহ সাধনায় সাহিত্যই তার পথের দিশারী।

আজকের দিনের সামাজিক রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও আলোড়নের মধ্যে ন্যায় ও কল্যাণের অভিমুখে যেসব স্রোত বইছে, একদিন তারা জয়যুক্ত হবে বলেই আমরা আশা করি। তা যদি না হয়, তাহলে পৃথিবীর বক্ষপঞ্জরে লুপ্ত ডাইনোসরের মতো মানুষও প্রাণের ইতিহাসের কঙ্কাল-সাক্ষীরূপে আরও কোনো সৌভাগ্যশালী ও সুবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীর জীবাশ্ম-সন্ধানীদের আলোচনার বস্তু হবে মাত্র।

শান্তি ও সুখ, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে ওঠবার সমস্ত পাথেয় সত্ত্বেও মানুষ শুধু নিজের লুব্ধ নির্বুদ্ধিতায় তার গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার ইতিহাসের ওপর এরকম বিস্মৃতির

যবনিকা টেনে আনবে, একথা ভাবতে এখনো আমরা চাই না। এখনো আমাদের আশা হয়—আচ্ছন্ন বুদ্ধির এ-তিমির রাত্রি পার হয়ে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পথে তার অভিযান কোনোদিন থামবার নয়। আমাদের এ-আশা ও প্রার্থনা যদি সফল হয়, আজকের দুর্যোগের অমানিশা মানুষ যদি পার হতে পারে, তাহলে দেহের প্রয়োজন ও ক্ষুধার দাসত্বে অধিকাংশ মানুষকে পশুর স্তরে আর আবদ্ধ থাকতে হবে না।

পৃথিবীর চেহারা সেদিন নিশ্চয় বদলে যাবে, বিজ্ঞান মানুষকে শুধু শক্তি ও প্রাচুর্যই এনে দেবে না, দেবে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য, দেবে আনন্দের অজস্র উপকরণ।

কিন্তু তবুও সাহিত্যের প্রয়োজন সেদিন মিটে যাবে না, সেদিনকার সাহিত্য তখনও প্রশ্ন করবে, ততঃ কিম্, বলবে— যেনাহম্ অমৃতঃস্যাম তেনাহম্ কিম্ কুর্যাম।

সমস্ত অশান্তি অভাব অন্যায় অবিচার পার হয়ে যাবার পরও সাহিত্যের কাজ ফুরোবে না। মানুষের যাত্রাপথের আগে আগে আশার আনন্দের বর্তিকা জ্বালিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে নব নব জিজ্ঞাসা সে তখন তুলে ধরবে।

ক্ষোভ ও অভিযোগ যে সাহিত্যের প্রাণ, সে সাহিত্য সেদিন আপনা থেকে স্তব্ধ হয়ে যাবে, 'যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো'—এ আর্ত প্রশ্ন সেদিন নিরর্থক হয়ে যাবে, কিন্তু 'এই ত ভালো লেগেছিল আলোর নাচন পাতায় পাতায়'—কি 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে,

জলসিঞ্চিতক্ষিতি সৌরভ রভসে, ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা'—কি 'তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠি'-এর আবেদন নষ্ট হয়ে যাবে, মানুষের মন ও প্রকৃতির এমন মৌলিক পরিবর্তন হতে পারে বলে তো মনে হয় না।

অনেক ism-এর উদয় হবে অনেক ism অস্ত যাবে, কিন্তু পৃথিবীর ঋতুরঙ্গের চিরনূতন বিস্ময়, মানুষের হৃদয়ের জটিল রহস্য, জীবনের অন্তহীন জিজ্ঞাসা চিরকালই সাহিত্যকে নব নব প্রেরণা যোগাবে।

কোনো ism-এর যেদিন জন্ম হয়নি, সেদিনকার বৈদিক ঋষির আনন্দবিহ্বল কণ্ঠের মন্ত্র—অসীম পারাবার পার হয়েও সমান সত্যই থাকবে—

আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রত্যয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।

সাহিত্যে রোমাঞ্চ

জাত যদি যায় যাক, তবু নির্লজ্জভাবেই স্বীকার করছি যে রহস্য কাহিনী আমি ভালোবাসি।

আজ নয়, চিরকালই ভালোবাসি এবং শুধু ডিটেকটিভ গল্প নয় রোমাঞ্চকর যত রকমের গল্প আছে সব কিছুরই বরাবর আমি ভক্ত। এখনও ভালো সেরকম গল্প পেলে আহার নিদ্রা আমি ত্যাগ করতে পারি। আহার নিদ্রা ভুলিয়ে দেবার মতো রহস্য-কাহিনী অবশ্য যখন তখন পাওয়া যায় না।

এই প্রাকৃতজনোচিত অমার্জিত রুচির কথা শুনে যাঁরা ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন করবেন, ইচ্ছে করলে তাঁদের আমি আমার স্বপক্ষে বড় বড় নামের নজির দেখাতে পারি। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী অ্যাটলি থেকে বিশ্ববিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ইয়ুং পর্যন্ত রহস্য-মাদক-সেবীদের জমকালো নামের তালিকা তৈরী করা মোটেই শক্ত নয়। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, কারণ প্রাকৃতজনোচিত হওয়াটা আমার কাছে গালাগাল নয়। প্রাকৃত কথাটার শব্দমূল নিরর্থক নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

সাহিত্যে যাঁরা জাত বিচার করতে চান তাঁরা যতই নাসিকাকুঞ্চন করুন তাঁদের নাকের বালাই নিয়ে

গোয়েন্দা-গল্পের মারা যাবার অবশ্য কোনো সম্ভাবনা নেই। সাহিত্য সভার জমকালো আসরে তার আসন না মিলতে পারে কিন্তু সভার বাইরে তার গরিবানি তাঁবুতে ভিড় বুঝি সব সময়েই বেশী। তার মানে খুঁজতে বেশী দূর যেতে হবে না। আমাদের মনের সব চেয়ে প্রবল যে বৃত্তি, গোয়েন্দা-কাহিনীর আকর্ষণের হেতু তার মাঝেই পাওয়া যাবে। সে বৃত্তি হলো অজানা রহস্য সম্বন্ধে কৌতূহল।

গোয়েন্দা-কাহিনীর একটি প্রধান গুণ তার সরলতা ও সাধুতা। জটিল কুটিল শঠ কপট নিয়েই তার কারবার কিন্তু পাঠকের সঙ্গে সে কোনো চাতুরী করে না। সাহিত্যের নামে অন্য উপন্যাস গল্প ও নাটক, সৎ অসৎ শোভন অশোভন হালকা গভীর নানা সওদা ফিরি করতে পারে কিন্তু গোয়েন্দা-কাহিনীর বেসাতি খোলাখুলি শুধু রহস্য নিয়ে। ঘোর প্যাঁচ তার কাহিনীর মধ্যে যতই থাক বাইরের উদ্দেশ্যে এতটুকু নেই। অনেক ছদ্মবেশী সাহিত্যের মতো নিরীহ অসন্দিগ্ধ পাঠককে গল্পের প্রলোভনে উদ্ভট নীতির সমস্যায় এনে ফেলে, ধান ভানতে শিবের গীত সে গায় না।

কিন্তু এ ছাড়াও ডিটেকটিভ গল্পের আকর্ষণের আরো নিগূঢ় কারণ আছে। সেই কারণেই, অবজ্ঞা করা দূরে থাক রহস্য কাহিনীর চর্চাকে প্রশ্রয় দেবারই এ যুগে বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়।

যান্ত্রিক শৃঙ্খলা দিয়ে মুড়ে' আমরা পৃথিবীকে আসলে ম্লান হলেও বাইরের চেহারায় অত্যন্ত নিরাপদ একঘেয়ে ও

সাধারণ করে’ তুলেছি। রোমাঞ্চকর কাহিনী, যত অপটুভাবেই হোক, সেই সাধারণত্বের পর্দা সরিয়ে পৃথিবীর অন্তহীন রহস্য-ঘনিমাই বারবার ঘোষণা করতে চায়। ট্রামে বাসে আপিস পর্যন্ত যাদের দৌড় অজানা দুঃসাহসের পথে বার হবার সুযোগ তারা এই গল্পের পাতাতেই পায়। আমাদের অভ্যাসে বাঁধা মন পায় অপ্রত্যাশিতের মধ্যে মুক্তি।

এ মুক্তির পথ না থাকলে কি যে হ’তে পারে কিছুই বলা যায় না।

সভ্য জানোয়ার বললে মানুষকে কতকটা বর্ণনা করা যায় বটে কিন্তু দুটি অত্যন্ত মূল্যবান বিশেষণ উহ্য থাকায় বর্ণনা একেবারে অসম্পূর্ণ থাকে।

মানুষ হয়তো সভ্য জানোয়ার হতে পারে, কিন্তু সে যে ভয়ঙ্কর জানোয়ার,—শুধু ভয়ঙ্কর নয়, সে যে ভয়ঙ্কর উন্মত্ত জানোয়ার এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তার সভ্যতা এক হিসেবে এই উন্মত্ততারই প্রকাশ। ভয়ঙ্কয় উন্মত্ততায় সে পশুত্বের সীমা পার হয়ে গিয়েছে, প্রকৃতির নিশ্চিন্ত নির্দিষ্ট নিরাপদ গণ্ডি ছাড়িয়ে পার হয়ে এসেছে অসীম অনিশ্চিয়তায়।

সত্যকথা বলতে গেলে পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র দুর্দান্ত বন্য মুক্ত জানোয়ার। আর সমস্ত জানোয়ারই পিঞ্জরাবদ্ধ পরাধীন। তারা বিবর্তনের স্রোতে ভেসে এসে যে চড়ায় আটকে গেল সেই খানেই আছে আবদ্ধ হয়ে। নির্দিষ্ট

সীমার মধ্যে বেঁধে প্রকৃতি তাদের পোষ মানিয়ে ফেলেছে। তারা সে বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে জানে না। সুন্দরবনের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কারাগারে বাঘ হিংস্রত্বের সীমার মাঝে বন্দী হয়ে আছে এ কথা ভাবা বোধ হয় ভুল নয়। চৌবাচ্চায় ধরে না বলেই তিমি মাছকে সমুদ্রে জীইয়ে রাখা হয়েছে বলাটা খুব বাড়াবাড়ি নয়। যাযাবর হাঁসকে সত্যিই সংস্কারের সুতোয় বেঁধে ঘুড়ির মতো ছেড়ে দেওয়া আর গুটিয়ে নেওয়া চলেছে।

মানুষ ছাড়া স্বাধীন দুর্দান্ত জানোয়ার আর কিছু নেই। এই উন্মত্ত জানোয়ারকেই শুধু পোষ মানানো যায় না। সে-ই শুধু কোথাও আটক থাকে না। তার এই উন্মত্ততা সারানো যায়, এমন কথা ভাবার মতো ভুলও আর কিছু নেই। শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে তার এই উন্মত্ততা দমন করে রাখা যেতে পারে মনে করা আহাম্মুকি।

সে উন্মত্ততা মাত্র কিছুদিনের জন্যে সুপ্ত থাকে, তারপর অগ্ন্যুদ্গারে বেরিয়ে পড়ে যে কোনো ছুতোয়। ইতিহাসে সম্ভবতঃ আমরা ছুতোটাকে বড় করে দেখে ভুল করি। বিপ্লব যখন হয়, তখন উন্মত্ত হওয়ার উল্লাসটাই হয় তো মুখ্য, রঙীন পতাকায় যে উদ্দেশ্য ঘোষিত হয় সেটা অজুহাত মাত্র। মেরু কি মরু-অভিযানে দুঃসাহসীদের কাছে মেরু কি মরুটাই বড় নয়। বড় যে শুধু মৃত্যুর সম্ভাবনার রোমাঞ্চ একথা বললে খুব ভুল হয় কি? উন্মত্ত ভাবে মরতে পাওয়া যায় বলে-ই মানুষ কখনও কখনও শান্তভাবে বাঁচতে ভালোবাসে,

কিন্তু সে শান্তি তার স্বাভাবিক নয়। তার ভেতরকার গভীর উন্মত্ততা তাতে শান্ত হয় না। যা তার ব্যাধি সেই উন্মত্ততাই হয়তো তার প্রাণ-ধর্ম। রোগ সারলে রোগীও বাঁচে না। উন্মত্ততা গেলে মানুষের মনুষ্যত্বও বুঝি যায়।

সারিয়ে ফেলা নয়, বিভ্রাট ঘটা নিবারণ করতে এ উন্মত্ততাকে শাসনে রাখা দরকার। এঞ্জিনের উদ্বৃত্ত বাষ্পবেগের মতো সেফ্‌টি-ভাল্‌ভের পথ তার জন্যেও খোলা রাখা চাই। রহস্য রোমাঞ্চের কাহিনী এই রকম একটি নিরাপদ ছিদ্রপথ, আমাদের মনের দুরন্ত বাষ্পবেগকে কিছু মুক্তি দিয়ে যা সমাজকে বিপর্যয় থেকে ঠেকায়। রহস্য রোমাঞ্চের কাহিনী পড়তে পাই বলেই হয় আমরা নির্বিবাদে নির্বিকারভাবে দু'বেলা আপিস ঘর করতে পারি।

রহস্য-রোমাঞ্চের স্বপক্ষে যেমন বিপক্ষেও তেমনি বলার কিছু নেই এমন নয়।

পৃথিবীটা যে অসীম রহস্যময় একথা জানবার সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পথ তাকে বলা আদৌ চলে না। তাঁর একটা মহৎ দোষ এই যে কাছের অত্যন্ত মোটা জিনিস ছাড়া আর কিছু সে চেনে না। তার রঙ্-কাণা চোখে লাল ছাড়া আর বুঝি কোনো বর্ণ দুনিয়ায় নেই। খুনো-খুনি না হওয়া সত্ত্বেও আমাদের পাশের বাড়ি যে রূপকথার মায়াপুরীর চেয়ে রহস্যময় হতে পারে এ খবর সে জানে না; গোয়েন্দার চেয়েও যে অদ্ভুত মানুষ প্রতিদিন রাস্তা ঘাটে ভিড় করে থাকে সে, কথা সে ভুলে গিয়েছে, হত্যাকারীর চেয়ে রহস্যময় গোপন

সত্য যে আমরা প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্তে নিঃশব্দে বহন করে নিয়ে চলেছি এ কথা সে বুঝতে পারে না।

দুঃসাহসের গল্পেরও দোষ এমনি একটি,—সমস্ত দুর্গম বিপদ সঙ্কুল পথে ঘুরিয়েও, অপরূপ পৃথিবীর সেই একটি বিস্ময়কর প্রান্তে সে গল্প আমাদের কখনও সাহস করে নিয়ে যায় না,—যে প্রান্তে আমাদের নিজেদের বাস।

খোকার খেলনা

আজ সকালে হঠাৎ ঘুম ভাঙার পর চোখ মেলতে গিয়ে আমি আতঙ্কে অভিভূত হয়ে গেলাম। মনে হলো অপস্রিয়মান ঘুমের সমুদ্রের ঢেউই বুঝি বাস্তবতার বালুবেলায় ভয়ঙ্কর কোনো দুঃস্বপ্নকে ভুলে ফেলে গিয়েছে; স্বপ্নের কোনো বিভীষিকাই বুঝি মুহূর্তের অসতর্কতায় জাগরণের জগতে আটকা পড়ে গিয়েছে।

ঘুম আর জাগরণের মধ্যে যে গোধূলি-ছায়ার অস্পষ্ট জগৎ সেইখানেই সবে তখন আমি প্রবেশ করেছি। কিন্তু যে জগৎ সাধারণতঃ আলস্যের মধুর অবসাদে আচ্ছন্ন থাকে, রাত্রের সুরভি যা থেকে সহজে মিলোতে চায় না সেই জগৎ আমার কাছে তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

নিদ্রাজড়িত অর্ধনিমীলিত চোখে, অস্পষ্ট অন্ধকারে আমি দুটি অগ্নিময় চোখের তীব্র জ্বালা প্রথম অনুভব করলাম। তারপর বুঝতে পারলাম আমার বুকের ওপর অপার্থিব কোনো ভয়ঙ্কর জীব চেপে বসেছে। পৃথিবীর কোনো প্রাণীবিশেষের সঙ্গে তার সুদূর সাদৃশ্য হয়তো আছে। কিন্তু সেই নামমাত্র সাদৃশ্যই তাকে দিয়েছে বিকটতম ব্যঞ্জনা; যেন শয়তানের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গনিপুণ হাতে বিধাতার সৃষ্টির সৌষ্ঠবরেখা বেঁকে গিয়েছে উন্মত্ত ভীষণতায়।

সে জীবকে শুধু ঘোড়ার মতো বললে যেন সমস্ত অশ্বজগৎকে নিদারুণ অভিশাপ দেওয়া হয়। দেহের প্রতি রেখায় অশ্বত্বের সীমাকে সে দানবীয় বীভৎসতায় প্রসারিত করে দিয়েছে। যদি তুরঙ্গ হয়, তাহলে সে প্রলয়-সায়াহ্নের তুরঙ্গ ; চোখে তার ধ্বংসের সেই দাবানল, ভঙ্গিতে তার সংহারের ক্ষিপ্রতা।

ধর্ম-বিশ্বাস আমার গভীর না হলে মনে করতে পারতাম যে যুগান্তরে সন্ধিক্ষণ বুঝি অকালে এসে পড়েছে, সৃষ্টিকে তার সম্পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হবার সুযোগ না দিয়েই শুরু হয়েছে শেষ সংহারলীলা, ঝঞ্ঝা-ধূসর দিগন্ত আড়াল করে কল্পান্তের প্রলয়-নায়ক কল্কিরই বাহন আছে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু এ আতঙ্কের দুর্বলতাকে আমি শেষ পর্যন্ত জয় করলাম, যেমন করে সমস্ত মিথ্যা বিভীষিকাকেই জয় করতে হয়।

আমি ভালো করে চোখ খুলে তাকালাম এবং সেই মুহূর্তে ফুটো করা বেলুনের মতো চুপসে, সেই বিরাট বিভীষিকা অকিঞ্চিৎকর সামান্য একটা খেলনা হয়ে দাঁড়ালো।

আমার বুকের ওপর খোকার খেলবার একটা রঙীন কাঠের ঘোড়া। খানিক আগে আমার ঘুমের সুযোগে সে আমার বুকটাই খেলবার উপযুক্ত স্থান হিসেবে বোধ হয় নির্বাচন করেছিল। খেলা সাঙ্গ করে খেলনাগুলি সে ভুলে ফেলে গিয়েছে। বুকের ওপর তাই কাঠের ঘোড়া দাঁড়িয়ে। খেলাঘরের বন্দুক প্রভৃতি পাশে রয়েছে সাজানো।

বৃষ্টি এল

প্রলয়-সায়াহ্নের তুরঙ্গকে খেলনার কাঠের ঘোড়াতে রূপান্তরিত হতে দেখে আমার কিন্তু ঠিক হাসি পেলো না। আমার মনে হলো এতদিনে যেন খেলার সত্যকার গূঢ় অর্থ আমার কাছে ধরা দিয়েছে। সহসা আমি সমস্ত খেলা ও খেলনার মানে বুঝতে পেরেছি।

আমাদের কাছে খেলনা মাত্রেই কেমন একটু মজার। তার ভেতর জীবনের অনুকরণের চেষ্টা একটু হাস্যকর। যেমন হাস্যকর শিশুর আধো আধো ভাষা। কাঠের ঘোড়া আধো আধো ভাবে সত্যিকারের ঘোড়া হতে চায় এবং সেই জন্যেই সে কৌতুকের বস্তু। যে আড়ষ্টতার ফলে সে বাস্তবতাকে ধরি ধরি করেও ঠিক নাগাল পায় না, তা দেখলে আমাদের হাসিই পায়। কিন্তু হাসি জিনিসটা বদলে যায়। খেলনার হাসি অনায়াসে অট্টহাসি হয়ে উঠতে পারে।

আসলে খেলনা মাত্রই ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর তার বাস্তবতার বিকৃতিতে, ভয়ঙ্কর তার সম্ভাব্যতার বিস্তৃতিতে। নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যে যুক্তিহীন আকারহীন অন্ধকার অসীমতা আছে তারই ইঙ্গিত সে করে। সীমায় সঙ্কীর্ণ হয়ে না থাকলে জীবনে সব কিছু মূল্যবান জিনিস যে সেই অসীমতায় বিকৃত বিপুল বীভৎস হয়ে উঠতে পারে, ধর্ম আর নীতি, আদর্শ আর পথ যে সীমার নিষ্ঠাতেই সত্য হয়ে থাকে খেলনা হয়তো ভয়ঙ্কর ইসারায় সেই কথাই জানায়।

খেলনার এই ভীষণতা আমাদের বয়স্ক অজ্ঞতায় আমরা না জানতে পারি কিন্তু তার দীপ্ত সারল্যে শিশু তা জানে।

খেলনাকে সে বড় হতে দেয় না কারণ সে জানে লঘুভাবে নাড়াচাড়া করবার জিনিস এ নয়, অসীম তন্ময়তা দিয়ে তার সাধনা করতে হয়। শিশুর প্রতিভা ও গভীর তন্ময়তা আমাদের নেই বলেই খেলনা আমাদের ব্যবহারের অযোগ্য। ব্যবসা চালানো থেকে নগর-নির্মাণ বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতো ছোট সহজ কাজ আমরা করতে পারি কিন্তু খেলা করার গুরুতর দায়িত্ব শিশুর জন্যে বরাদ্দ রাখাই আমাদের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচয়। বাস্তবতা যেখানে তার সীমা লঙ্ঘনে উদ্যত, সেই অকূল অনির্দিষ্ট ছায়াময় জগতের ব্যাপার সামলাতে প্রত্যাদিষ্ট শিশুর সারল্যই পারে।

এই সত্য, মোহাচ্ছন্ন মনের আধ-অন্ধকারে যেদিন আমরা ভুলে যাই সে দিনই হয় সর্বনাশের সূত্রপাত। আমাদের খেলনা হঠাৎ সমস্ত সঙ্গতির গণ্ডী ছাড়িয়ে বিভীষিকাময় অট্টহাসি করে উঠে। আমাদের খেলা হয়ে ওঠে আত্মঘাতী উন্মত্ততা।

খোকার খেলনাগুলি তাই আমি সভয়ে সশ্রদ্ধায় সরিয়ে রেখে দিলাম। সে খেলনা নাড়া চাড়া করতে আমার সাহস হয় না। আমি জানি বড়দের আনাড়ি হাতে খোকার কাঠের ঘোড়া সহসা বিপুল অশ্বারোহী-বাহিনী হয়ে শ্যামল প্রান্তর বিধ্বস্ত করে চলে, খোকার খেলার বন্দুক বিশাল হাউইটজার হয়ে মৃত্যু বর্ষণ করেও তৃপ্ত হয় না, আরো পৈশাচিক হত্যালীলার জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে।

মাত্রা রাখতে না জেনে খেলনার উন্মত্ত বিভীষিকাকে

যেদিন আমরা হাত ছাড়া করে ফেলি, নিজেদের খেলার ভয়ঙ্কর পরিণামে যেদিন আমরা আতঙ্কে শিউরে উঠি, সেদিন ভালো করে চোখ মেলে আমাদের উপলব্ধি করা দরকার যে খোকার খেলনায় ভুল করে আমরা হাত দিয়েছি।

খোকার খেলনা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। নিরাপদ পৃথিবী ছেড়ে খোকার রহস্যময় খেলাঘরে আমরা যেন অনধিকার প্রবেশ না করি।

নির্জন-বাস

কিছুদিন আগে, যাকে বলে হাওয়া বদলাতে অত্যন্ত নগণ্য একটি জায়গায় গিয়েছিলাম। জায়গাটি নগণ্য বলছি এই কারণে যে সেখানে ট্রাম, মোটর তো নেই-ই এমন কি ঘোড়ার গাড়ি পর্যন্ত চলে না! না আছে সিনেমা, না আছে ব্যাঙ্ক, সনাতন একটি মুদির দোকান ছাড়া মনোহারী দোকান পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষের ভিড় নেই, গোলমাল নেই। জীবনের দুরন্ত প্রবাহে ক্ষণে ক্ষণে সেখানে কোনো আবর্তের সৃষ্টি হয় না।

মন্দাক্রান্তা চালে সেখানকার জীবন চলে। দিনে ও রাতে দু'বার লোকাল ট্রেনের আনাগোনা সেখানকার একমাত্র উত্তেজনা। ঢেউ খেলানো রাঙা মাটির তেপান্তরে হারিয়ে যাওয়া, টালিতে ছাওয়া একটি ছোট স্টেশনে সবশুদ্ধ মিনিট দুই-এর জন্যে একটু চাঞ্চল্য এনে চারটি কি বড় জোর পাঁচটি গাড়ির মোড়ল একটি ছোট এঞ্জিন একবার বুকখালি করা ডাক দিয়ে, একরাশ কালো ধোঁয়া ছেড়ে দূরের শালবন ঢাকা পাহাড়ের আড়ালে উধাও হয়ে যায়। তারপর দিগন্ত-জোড়া নিস্তব্ধতায় শুধু হয়তো একটা ঘুঘুর ডাক, পৃথিবীর হৃদ্‌স্পন্দনের মতো থেমে থেমে কোথায় কোন কাঠুরের কুড়ুলের ঘা।

গুটি দশেক মাত্র বাড়ি এই ছোট স্টেশনটিকে ঘিরে

প্রত্যেকে প্রায় বিঘে আষ্টেক জমিতে হাত পা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িগুলি কোনোটিই নতুন নয়। বছর ত্রিশ আগে বাংলার ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত কয়েকজন স্বাস্থ্যান্বেষী সস্তা দেখে এখানে এসে বোধ হয় এই সব ছুটির ডেরা তৈরী করে গিয়েছিলেন। সে সস্তার দিন তারপর শেষ হয়ে গিয়েছে। আইন কানুনও এ দেশের কড়া হয়েছে। স্বাস্থ্যান্বেষীদের উপনিবেশ তাই আর প্রসারিত হ'তে পারে নি। লীলা-নিকেতন, শান্তি-কুলায় প্রভৃতি কাব্যময় নামের গুটি দশেক বাড়ির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে।

এই গুটি দশেক বাড়ি প্রায় সারা বৎসর খালিই থাকে। জন কয়েক মালী মরজি মাফিক তাদের তত্ত্বাবধান করে। তারপর পূজোর মাস শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে একটি দুটি পরিবার সেখানে আসতে শুরু করে। শীতের ক'টা মাস বাড়িগুলিতে একটু-আধটু জীবনের চাঞ্চল্য দেখা যায়। ফাল্গুন-চৈত্রে শিমূলবন ন্যাড়া হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চাঞ্চল্য আবার যায় মিলিয়ে।

আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন শীত সবে পড়তে শুরু করেছে। বাড়িগুলির অধিকাংশই খালি। প্রায় একেশ্বর হয়েই কিছুদিন তাই থাকতে পেয়েছিলাম।

শহুরে জীবনের উর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ততা থেকে এরকম জায়গায় গেলে প্রথমটা সকলেরই যা হয় আমারও তাই হলো। শরীর কতদূর সারলো তা বলতে পারি না কিন্তু মনে হলো সমস্ত মনটা যেন জুড়িয়ে গিয়েছে। শহরের অবিরাম আবর্তে যে সমস্ত

স্নায়ুমণ্ডলি জট্ পাকিয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, সেখানকার সুগভীর নির্জনতা যেন তাদের সমস্ত গ্রন্থি খুলে দিয়ে আবার সুস্থ করে তুললো। সেখানকার নিস্তব্ধতা শুধু গোলমালের অভাব নয়, ইন্দ্রিয়গোচর একটা সুস্পষ্ট বস্তু। ভোরের বেলায় আঁকা বাঁকা পাহাড়ী নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে সেখানকার নির্জনতা যেমন উপভোগ করি, রাত্রে দীপহীন বারান্দার ওপর আরাম কেদারায় বসে থাকতে থাকতে নক্ষত্র খচিত আকাশ থেকে ক্ষরিত গাঢ় নিস্তব্ধতা সমস্ত হৃদয়কে যেন তেমনি স্নিগ্ধ শুচি করে দিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

এই নির্জনতা ও স্তব্ধতা, জীবনের এই শান্ত মন্থর মধুর ছন্দ সকলকেই বোধ হয় দু' একদিনে বেশ অভিভূত করে ফেলে। সারাক্ষণ হন্তদন্ত-হয়ে-ছোটা হাঁসফাঁস করে মরা জীবনের বিরুদ্ধে মন হঠাৎ বিমুখ হয়ে ওঠে। আমারও তাই হলো।

মনে হলো এমন জায়গা থাকতে আর কোথাও থাকার কোনো মানে হয় না। এই শান্ত নিরুপদ্রব পরিবেশের মাঝে প্রকৃতির সঙ্গে মধুর একটি ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের সঙ্গে নিজেকে ভালো করে উপলব্ধি করা—এর চেয়ে বড় লক্ষ্য জীবনের কিছু হওয়া উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কথাই মনে পড়লো—সংসারের কোলাহল থেকে সাধকদের দূরে সরে যাওয়ার কথা, প্রাচীন কালের তপোবনের আদর্শ, জীবনের নিত্যকার সংগ্রামের ক্লান্তি থেকে মুক্তি নেবার জন্যে মানুষের চিরকালের ব্যাকুলতা, সব কিছুরই সুর বুঝি আমার মনের সঙ্গে মেলানো।

মনের এমন অবস্থায় ঠিক 'শান্তি-কুলায়' না হোক ওই গোছের একটা নামের কিম্বা সম্পূর্ণ বেনামী একটা বাসা গড়বার চেষ্টায় আশে পাশে জমির খোঁজ করতে বার হওয়া বোধ হয় অস্বাভাবিক নয়। জমির খোঁজ করতে গিয়েই দেবনাথবাবুর সঙ্গে পরিচয়।

দেবনাথবাবু প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে এখানকার একমাত্র স্থায়ী বাসিন্দা। সস্তার দিনে প্রচুর জমি কিনে তার উপর তিনি বিরাট বাড়ি করেছেন, কাঁটাতারের বেড়া-ঘেরা তাঁর বহুদূর বিস্তৃত বাগানে সব রকমের চাষই তিনি সযত্নে করে থাকেন। এ অঞ্চলের ওপর তাঁর অসীম প্রভাব, সব কিছুর খোঁজও তিনি রাখেন।

বয়সে প্রৌঢ় হলেও দেবনাথবাবুর বেশ শক্ত সমর্থ চেহারা। মুখে একটি সৌম্য প্রশান্তি আছে। কথাবার্তা খুব কমই বলেন, যা বলেন তা বেশ ওজনে ভারী। জমি কিনে বাড়ি করতে চাই। শুনে জিজ্ঞাসা করলেন,—কি জন্যে বাড়ি করতে চাই। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবার জন্যে না স্থায়ীভাবে বসবাস করতে?

বললাম—স্থায়ীভাবেই যদি থাকি!

মনে হলো একটু হাসির আভাস যেন তাঁর মুখে দেখা গেল। বললেন,—পারবেন বরাবর থাকতে?

কেন পারবো না—বলে হঠাৎ এ জায়গার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম।

শান্ত ভাবে আমার সমস্ত কথা শুনে তিনি যা বললেন,

'শান্তি-কুলায়' বা ওই গোছের কিছু এই নির্জনতার মধ্যে গড়বার বাসনা তাইতেই পরিত্যাগ করে এলাম। পরিত্যাগ করে এলাম শুধু তাঁর বৈষয়িক যুক্তি শুনে নয়, এলাম হঠাৎ এই কথাই উপলব্ধি করে যে জীবনের নিত্যকার সংগ্রাম যত গ্লানিকরই হোক তা থেকে সম্পূর্ণভাবে কোথাও পালিয়ে বাঁচা যায় না। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে কয়েকজনের সুখ-সমৃদ্ধি-আলস্য-মন্থর অস্তিত্ব যেমন বহুর অভাবপীড়িত জীবনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, এই নির্জনতায় শান্ত নিরুপদ্রব জীবন-যাপনের নেপথ্যেও তেমনি বহুদিনের বহুকালের নিত্য-জাগ্রত উদ্যোগ আয়োজন না থাকলে চলে না।

দেবনাথবাবু হয়তো পৈতৃক বা স্বোপার্জিত সম্পদের জোরে এখানে রাজার হালে নিশ্চিন্ত অবসর যাপন করতে পারেন, আমি হয় তো এখানকার নির্জনতার লোভে বহুদিকের ব্যয় সংক্ষেপ করবার চেষ্টা করতে পারি, তবু আমাদের শান্ত নিরুপদ্রব জীবনের নেপথ্যে সংগ্রাম সব সময়েই চলছে! সে সংগ্রামের দায়টুকু বাদ দিয়ে শুধু সুবিধেটুকু ভোগ করবার জন্যে আমরা তার প্রতি চোখ বুজে থাকতে পারি মাত্র।

এই নির্জনতার যারা সত্যকার সন্তান তাদের জীবন শান্তও নয় নিরুদ্রপবও না। ঢেউ খেলানো প্রান্তরের খাঁজে খাঁজে ছবির মতো যে সমস্ত মানুষের বসতি সাজানো আছে জীবন-নাট্যের গতি সেখানে দ্রুত না হলেও, সঙ্ঘর্ষময় আবর্তের সেখানে অভাব নেই। মানুষের ও মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংগ্রাম সেখানে নিত্য প্রখর! আকাশ সেখানে নিষ্করুণ হয়ে

অভিশাপ বর্ষণ করে, মাঠের চোখ জুড়োনো শ্যামলতার অন্তরালে কোন অজানা 'ভিরাস' সর্বনাশের বিষ ছড়ায়, পশু ও মানুষের মহামারী আসে অজ্ঞতা ও অসাবধানতার সুযোগ নিয়ে। ধর্মের খাদ মেশানো সামাজিক অর্থনৈতিক বিন্যাসের বহু যুগসঞ্চিত সংস্কার ও শৃঙ্খল গায়ে গায়ে জড়িয়ে তাদের জীবনে নিত্য নতুন আবর্তের সৃষ্টি করে। ক্ষীরু মিয়ার কাছে সস্তায় তরী তরকারী কি ভিখু গোয়ালার কাছে দুধ নেবার সময় তাদের জীবনের সংগ্রাম আমরা টের পাই না কিন্তু আমাদের নিশ্চিন্ত অবসর তাদের জীবনের দামেই কেনা।

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে নিসর্গ

আমার একজন অসাধারণ পণ্ডিত বন্ধু আছেন, যিনি প্রাচীন কালের সাহিত্য যথা কালিদাস কি ভবভূতি পড়ে তখনকার দিনের নাড়িনক্ষত্র মায় আবহাওয়া-বিবরণী পর্যন্ত বাৎলে দিতে পারেন। তাঁকে সাহিত্যের একজন গোয়েন্দা, কিংবা গোয়েন্দা কথাটা যদি দূষ্য হয়, তাহলে একরকম গ্রহাচার্য বলা যেতে পারে—ভবিষ্যতের বদলে অতীতই যাঁর গণনার বিষয়।

আজকের কথা নয়, কিন্তু আজ থেকে পাঁচশত বৎসর পরে, কোনও বিরাট প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বাংলা দেশের চেহারা যদি বদলে যায়, তাহলে তখনকার সাহিত্য-গ্রহাচার্যদের পক্ষে যাঁদের রচনা থেকে এ দেশের পূর্বকালের ছবি গড়ে তোলা সম্ভব হবে তাঁদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথই প্রধান।

সত্যি কথা বলতে গেলে পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসবার পর যে-সাহিত্য আমাদের দেশে নব কলেবরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে তার মধ্যে বাংলা দেশের প্রকৃতির রূপ প্রথম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যেই যথার্থভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীতে নৈসর্গিক বর্ণনা আছে কিন্তু তাঁর

নিসর্গ অনেকটা দেশহীন কালহীন ও অবিশেষ। কপালকুণ্ডলায় যে সমুদ্র উপকূলের বর্ণনা পাই তা এই দেশেরই সন্দেহ নেই, তবু তাঁর সমগ্র রচনায় বাংলার নিজস্ব বিশেষ নিসর্গ-রূপ কোথাও ধরা দেয়নি।

বাংলার নিসর্গ-সত্তার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের লেখাতেই সর্বপ্রথম সাহিত্যে দেখা যায়। দেখা যায় শুধু তার ছোট গল্পে নয়, তাঁর কাব্য উপন্যাস থেকে ছিন্নপত্র অবধি সমস্ত কিছু রচনায়।

একদিক দিয়ে বলতে গেলে বাংলার বিশেষ নিসর্গ-সত্তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সমস্ত সাহিত্য-প্রেরণার মূল উৎস। অন্ততঃ তাঁর ছোট গল্পের ক্ষেত্রে তো বটেই।

বাংলার নিসর্গ-সত্তা প্রধানতঃ দুটি বিভিন্ন ও বিপরীত উপাদানের সংমিশ্রণ। একদিকে তার কূলভাঙা দুরন্ত নদীর অবিরাম অস্থিরতা আর একদিকে তার রুক্ষ বন্ধুর কঙ্করময় প্রান্তরের উদাস উদার ব্যাপ্তি। একদিকে তার ব্যাকুল বেগ, আর একদিকে বিশাল বৈরাগ্য। রবীন্দ্রনাথের স্রষ্টা-মানসও এই দুই পরস্পরবিরোধী উপাদানের আশ্চর্য সামঞ্জস্যে তৈরী। তাই বলা যায় এ দেশের নিসর্গ-সত্তাই তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে রূপায়িত।

নিসর্গ-প্রীতি আর নিসর্গ-চেতনা এক জিনিস নয়। নিসর্গ-প্রীতি বলতে আমরা যা বুঝি, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি সম্বন্ধে বোধ, তা দিয়ে ঠিক বোঝানো যায় না। তা প্রকৃতির সঙ্গে

একাত্মতার এমন একটি উপলব্ধি, প্রাণের গভীর মূল থেকে আপনা হতে যা সঞ্জাত। নিসর্গ-প্রীতির বদলে একে নিসর্গ-চেতনা বোধ হয় বলা যায়।

এই নিসর্গ-চেতনার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের নানা ধরনের অসংখ্য রচনায় বহু বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

'মেঘের কোলে কোলে যায়রে চলে বকের পাঁতি' তিনি যখন লেখেন তখন তা শুধু একটা মধুর ছবিতেই আবদ্ধ থাকে না, 'ঘর ছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ওই গাঁথি গাঁথি।'-র সঙ্গে সে ছবি ধ্বনির দোলায় দুলে এমন এক অনুভূতির তীরে গিয়ে পৌঁছোয় যেখানে তার সব রঙ আর রেখা আর এক ভাষাতীত রসে গিয়ে রূপান্তরিত হয়।

গানে ও কবিতায় রবীন্দ্রনাথের নিসর্গ-চেতনার যে প্রকাশ দেখি ছোট গল্পে তা অবশ্য বিভিন্ন হতে বাধ্য। তবু এ দেশের নিসর্গ-সত্তাই যে তাঁর ছোট গল্পের প্রেরণা যুগিয়েছে একথা বললে বোধহয় খুব ভুল হয় না।

বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক ছোট গল্প তিনিই সৃষ্টি করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর প্রেরণার উৎস সন্ধান করতে কোনো দূর দেশ বা কালে অভিযান করবার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। তাঁর গল্প রচনার তারিখ থেকেই সে হদিস পাওয়া যেতে পারে।

১২৯৮ সাল থেকেই তাঁর রচনায় গল্পের নূতন জোয়ারের সূত্রপাত হয় বলা যায়। এ জোয়ার যখন এসেছে তখন জমিদারীর তদারকী উপলক্ষ্যে কখনও পদ্মার প্রশস্ত বক্ষে,

কখনও কোনো শীর্ণ শাখা নদীর মধ্যে বজরার ওপর ভাসমান অবস্থায় তিনি দিন কাটাচ্ছেন।

নদীবক্ষে বাসের সঙ্গে তাঁর গল্প রচনার তারিখের এই মিল নেহাৎ অর্থহীন ঘটনা-সংযোগ নয়। সেদিনকার সদাভাসমান জীবনযাত্রাই তাকে গল্প রচনার সত্যকার প্রেরণা যুগিয়েছে। মানুষের বিরাট বিস্তৃত জীবনলীলা গল্পের ছোট পরিসরে খণ্ডিত অথচ স্বসম্পূর্ণভাবে দেখবার ভঙ্গি তিনি বজরার জানলা থেকেই শিখেছেন। পদ্মার বক্ষ থেকে বোটের জানলার ফাঁক দিয়ে, নিত্য পরিবর্তনশীল তীরের জীবনের যে ছোট ছোট টুকরো তিনি দেখেছেন তাই সেদিন তার বেগবান্ কল্পনাকে নতুন নতুন গল্প বয়নের খেই যুগিয়েছে।

একদিক দিয়ে বলতে গেলে গল্প লেখা শেখবার পক্ষে নদীর চেয়ে বড় গুরু বুঝি আর হতে পারে না। পৃথিবীর সমস্ত সার্থক গল্পসৃষ্টির মূল রহস্য সন্ধান করতে গেলে বোধ হয় দেখা যাবে তা নদীর চোখে তীরের গল্প ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষের কাহিনী রচনার সন্দেহজনক সৌভাগ্য যাঁরা লাভ করেন, নদীর মতো এক মুহূর্তে গভীর ভাবে আপন করে নিয়ে পর মুহূর্তে নির্দয়ভাবে ছেড়ে যাবার নিয়তি তাঁদের মেনে নিতেই হয়। ভালোবাসায় বাঁধা পড়ে গেলে সংসার পাতা হয় তো হতে পারে, কিন্তু এক কাহিনী থেকে আর এক কাহিনীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার শক্তি বা অবসর আর তাহলে থাকে না।

যে যুগে তার অজস্র বিচিত্র দানের প্রাচুর্যে বাংলা সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে সমৃদ্ধ করেছেন,—বিশেষ করে তাঁর গল্প রচনার যা স্বর্ণময় যুগ, সে সময়ে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ ঠিক নদীর মতোই জীবনের কূল ছুঁয়ে যেতে যেতে তার অসংখ্য অফুরন্ত গল্পের ছায়া নিজের ধারাস্রোতে ফুটিয়ে তুলে পরক্ষণেই আবার বিস্মৃত হয়ে বিষয়ান্তরে বয়ে গিয়েছেন।

নদী যে দৃষ্টিতে তীরকে দেখে গল্প রচয়িতা হিসাবে তিনি তখন সেইভাবেই জীবনকে দেখেছেন। লোকালয়-সংলগ্ন অথচ তা থেকে বিচ্ছিন্ন, বিশাল বেগবান্ নদীর মতোই একদিকে পরম অন্তরঙ্গ আর একদিকে একান্ত নির্লিপ্ত উদাসীনভাবে তিনি তার গল্পে মানুষের খুঁটিনাটি থেকে বিরাট ও বিশেষ সমস্ত ঘটনা দেখে গিয়েছেন। সে দেখার মধ্যে একদিকে যেমন আছে সুনিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা,—তীরপ্রান্তবর্তী স্থল-সংলগ্ন জীবন-যাত্রার সঙ্গে নদীর চিরচঞ্চল ধারার মতো সুগভীর সংযোগ, তেমনি আবার আছে ক্ষণপরিচয়ের পর নির্বিকার নির্লিপ্ত ঔদাসীন্য, যা এক এক সময় নিষ্ঠুরতার সামিল বলেই মনে হয়।

হৃদয়ের গভীর আবেদনে আর্দ্র তাঁর পোস্টমাস্টার গল্পটির শেষ ক'টি ছত্র উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে বোধহয় তুলে ধরতে পারি।

'...এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল। তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব

করিতে লাগিলেন—একটি সামান্ত গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস লাগিয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদী প্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইয়াছে যে জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ কত মৃত্যু আছে। ফিরিয়া লাভ কি? পৃথিবীর কে কাহার?'

গল্পের শেষে এই প্রায় অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর মন্তব্যটি জুড়ে দেবার লোভ সম্বরণ করতে না পেরে গল্পটির শিল্পাদর্শ রবীন্দ্রনাথ যদি কিছু ক্ষুণ্ণ করে থাকেন তাহলে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ সমস্ত গল্পরচনার পেছনের দৃষ্টিভঙ্গিকেও আশ্চর্যভাবে ওই মন্তব্যে প্রকাশ করেছেন।

এ দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার নিসর্গ-সত্তারই দান বললে দাতা ও গ্রহিতা দুজনেরই গৌরব বোধ হয় বাড়ে বই কমে না।

কবিতা পড়া

সেদিন এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে গিয়েছিলাম।

সাংস্কৃতিক সম্মেলনের নাম আজকাল হামেশা শোনা যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক কথাটাও যেমন হালের, সম্মেলনের হুজুগটাও তেমনি নতুন।

সাংস্কৃতিক সম্মেলন নামটা বেশ গালভরা, তাই বেশ একটু আশা-আকাঙ্ক্ষায় দোদুল্যমান হয়েই সেখানে গিয়েছিলাম কিন্তু সম্মেলন শেষ হবার পর একটু যেন বিমূঢ় হয়েই ফিরে আসতে হ'ল। মনে হ'ল এরকম গান বাজনা কিছু আবৃত্তি ও কয়েকটা নরম গরম বক্তৃতা আমি আগেও যেন অনেক সভায় শুনেছি, সে সব কিন্তু সাংস্কৃতিক সভা ছিল না। সুতরাং ভুল আমারই নিশ্চয় হয়ে থাকবে। সূক্ষ্ম বোধশক্তির অভাবের দরুণই বোধহয় সাধারণ আর সাংস্কৃতিক সভার তফাৎটুকু আমি ধরতে পারিনি।

হ্যাঁ, তবে একটা তফাৎ আমার মোটাবুদ্ধিতেও ধরা পড়েছে। সভাপতি মশায় বাদে আর প্রায় সব বক্তাই তাঁদের বক্তৃতায় মিনিটে বার আষ্টেক করে সাংস্কৃতিক কথাটা জোরে জোরে উচ্চারণ করেছেন। হাটে হাঁড়ি ভাঙার মতো সভাপতি মশাই সাংস্কৃতিক কথাটার ঐতিহাসিক, দার্শনিক তাৎপর্য্যটুকু না বুঝিয়ে দিলে বেশ একটা হিংটিং ছট গোছের

শব্দের নেশা নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারতাম এবং পরবর্তী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে গিয়ে এ বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা নিজেই দিয়ে ফেলতে পারতাম। বক্তৃতার মূল্যবান কয়েকটি 'টিপ' আমি এর মধ্যে পেয়ে গিয়েছি। পুঁজি-বাদী, সর্বহারা কৃষক, মজুর, শ্রেণীবিরোধ ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে দেওয়াই বক্তৃতা সার্থক করার অব্যর্থ কৌশল—

আপনারা ভাবতে পারেন এসব তো রাজনৈতিক বক্তৃতার বাঁধা বুলি, কিন্তু সেইখানেই আপনাদের আমার মতো ভুল। সূক্ষ্মবোধশক্তি থাকলে বুঝতে পারতেন হুজুগের হাততালি তোলবার সস্তা প্যাঁচ বলে যা মনে হয় আসলে তা সংস্কৃতি বিষয়ক সারগর্ভ বক্তৃতা।

বক্তৃতার উত্তেজনা ও প্রভাবেই বোধ হয় আসল কথা থেকে একটু দূরে এসে পড়েছি। সেখানেই এবার ফিরে যাবার চেষ্টা করি।

সংস্কৃতি সম্মেলনে বসে একটা কথা সেদিন বড় বেশী করে মনে হচ্ছিল। বক্তৃতা শোনবার জন্যে আমরা সভা করি, গল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতিও সেখানে শুনতে যাই, গানের বৈঠকেরও আয়োজন করি কিন্তু আর একটি বিষয়ে আমাদের একেবারেই অনুরাগ নেই কেন?

কখন সখন সভায় কবিতা আবৃত্তি আমরা শুনে থাকি কিন্তু আবৃত্তি নয়, কবিতা পড়ার রেওয়াজ আমরা একেবারেই ভুলে গিয়েছি।

সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তার জন্ম প্রথম হয়

কবিতায়, এবং সে কবিতা শ্রাব্য। ছাপা হরফের প্রসার ও প্রভাব আমাদের মনের বহু স্বাভাবিক রুচি ও প্রকৃতি অনেকটা তছনছ করে দেবার আগে পর্যন্ত কবিতা পড়া এবং শোনাই একটা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। হিন্দি ও উর্দু ভাষায় কবিদের মুসায়েরা এখনো একেবারে বিরল হয়ে যায়নি।

কিন্তু বাংলায়, কবির লড়াই-এর গ্রাম্যতার অপবাদ নিয়েই কবিতা পড়ার রেওয়াজ বোধহয় বিদায় নিয়ে গিয়েছে।

সাহিত্যের এমন অনেক বিভাগ আছে, ছাপার হরফই যার উপযুক্ত ও একমাত্র বাহন। আজ কালের উপন্যাস কি প্রবন্ধ আসর পেতে পড়ে শোনালে শ্রোতাদের বোধ হয় খানিকটা শাস্তি দেওয়া হয়। লেখকের প্রতিও সুবিচার করা হয় না। কিন্তু কবিতা ভিন্ন জাতের জিনিস। শুধু স্বরলিপি পড়লে যেমন গানের মর্ম পাওয়া যায় না কবিতাও তেমনি শুধু কাগজে পড়ে উপভোগ করবার জিনিস নয়। তার ধ্বনি, তার ছন্দ, কানের সাহায্য না পেলে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সার্থক করতে পারে না।

কবিতার প্রতি সাধারণের ঔদাসীন্য সম্বন্ধে যে অনুযোগ আজকাল সর্বত্র শোনা যায় তার জন্যে কবিতার এই কৃত্রিম পরিবেশই অনেকটা দায়ী নয় কি? ছাপার হরফে নিজেকে একান্ত ভাবে বন্দী করেই কবিতা তার ভক্তদের ধীরে ধীরে হারাচ্ছে বলে আমার মনে হয়। কবিতা ছাপা হওয়া অবশ্য দরকার। কিন্তু মাঝে মাঝে লোকজন ডেকে তা শোনানোও একান্ত প্রয়োজন।

শোনাবার অন্য সার্থকতাও আছে। সিসের দেয়ালের আড়ালে নিজেকে স্বেচ্ছা নির্বাসন দেওয়ার দরুণ যে সব বিকার ও বাতিক তার মধ্যে দেখা দিয়েছে সকলের মাঝে সাহস করে বেরিয়ে এলে সে সব বোধ হয় সেরে যেতে পারে। চেঁচিয়ে পড়তে হ'লে বাজে চালাকির মোহ কবিদের বোধ হয় আপনা থেকেই কেটে যাবে।

কবিতা আবৃত্তির সুযোগ সভায় সমিতিতে রেডিওয় অবশ্য আছে কিন্তু আরো একটু ঘনিষ্ঠ বৈঠক কি আমরা প্রবর্তন করতে পারি না—যেখানে কবিতাকে হঠাৎ একেবারে হাটে নামতে হবে না অথচ মৌনতার ঘোমটা খুলে সে আর একটু স্বচ্ছন্দ সহজ হ'তে পারবে?

শরৎচন্দ্র

বয়স তখন অল্প, পাঠ্য-পুস্তকের শাসনের ফাঁকে ফাঁকে সবে তখন সাহিত্যলোকে গোপন অভিসার শুরু হয়েছে। এমন একদিনে, কেমন করে মনে নেই, একটি পুরানো মাসিক পত্রিকা আমার দৃষ্টিপথে এসে পড়েছিল।

মাসিক পত্রিকা তখন আকাশের তারা ও সকালের রোদের মতো বিস্ময়কর অপার্থিব একটি বস্তু। মানুষে তা নির্মাণ করে ও মুদ্রাযন্ত্রে নেহাৎ সাধারণভাবে তা ছাপা হয়ে দপ্তরীর কাছে বাঁধা হয়ে বাজারে বার হয় একথা কেউ বললে বিশ্বাস করতাম কিনা বলতে পারি না।

সেই অপরূপ মাসিক পত্রে তার চেয়ে অপরূপ একটি কাহিনী পড়েছিলাম। লেখকের নাম অবশ্য লক্ষ্য করিনি—সে বয়সও তখন নয়, কিন্তু আমার কৈশোর জীবনের অনেক দুঃখের ভেতর, একটি দুঃখ বড় হয়ে উঠেছিল মনে আছে। কাহিনীটি অসমাপ্ত এবং মাসিক পত্রিকাটির পরবর্তী সংখ্যাও আর আমার পাবার সৌভাগ্য হয়নি।

পত্রিকার কয়েকটি পাতায় যে ক'টি লোকের সঙ্গে সামান্য একটু পরিচয় হওয়াতেই মুগ্ধ হয়েছিলাম—তাদের সঙ্গে জীবনে আর সাক্ষাৎ হবে না, এই শোকই আমার কাছে চরম হয়ে উঠেছিল।

আমার জীবনে চকিতে একবার মাত্র দেখা দিয়েই এই যে ক'টি অসাধারণ পুরুষ ও নারী চিরদিনের মতো নিরুত্তর অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল, তাদের কথা সত্যিই অনেকবার তখন ভেবেছি। পরমাত্মীয়ের বিয়োগ ব্যথার মতোই তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা আমার মনে অনেকদিন একটি কাঁটার মতো ফুটেছিল।

কাহিনীটি যে মাসিক পত্রে পড়েছিলাম, তার নাম 'যমুনা'। উপন্যাসটির নাম বোধহয় বলে দিতে হবে না।

তারপর আর একটু বড় হয়ে অন্য একটি মাসিক পত্রিকাতেই বোধ হয়, একটি বই-এর বিজ্ঞাপন পড়েছিলাম। বিজ্ঞাপনের ভাষা ঠিক মনে নেই, তবে তার মর্মার্থ এইভাবে প্রকাশ করা যায়—মাসিক পত্রে যাঁহার রচনা পড়িয়া প্রথমে, রবীন্দ্রনাথই ছদ্মনামে লিখিতেছেন বলিয়া সাধারণের ধারণা হইয়াছিল,—সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস—।

সাহিত্যজগতে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব সত্যই এমনি আকস্মিক অকল্পিত বিস্ময়কর।

উষার আকাশ রাঙা হয়ে ওঠা থেকে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য গগনের শিখরে আরোহণের সমস্ত পর্বই সাধারণের চোখের সামনে ঘটেছে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব একেবারে অপ্রত্যাশিত। আকাশের ঘনমেঘ অপসারিত করে অকস্মাৎ তিনি পূর্ণ গৌরবে প্রকাশিত হয়েছেন—পূর্ণিমার চন্দ্রের মতোই স্নিগ্ধ মায়া তার জ্যোতিতে।

শরৎচন্দ্রের মতো এমন রহস্যমণ্ডিত হয়ে আর কোনো

লেখক অন্ততঃ বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে প্রবেশ করেন নি। এখন মনে পড়ে সেকালে সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর পরিচয় কি কুহেলিকাতেই আচ্ছন্ন ছিল! কত অদ্ভুত গুজব, কত অসম্ভব গল্পই না তাঁর সম্বন্ধে তখন শোনা গিয়েছে। সুদূর ব্রহ্মদেশ থেকে এসে এই যে কাহিনীর যাদুকর হঠাৎ এক শুভপ্রভাতে সমস্ত বাংলা দেশকে সচকিত চমৎকৃত করে দিলেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সংকেত অনুসরণ করেই মুগ্ধ ভক্তেরা সেদিন তাঁকে চিনবার চেষ্টা করেছে। সতীশ, উপীনদা, রমেশ এমন কি দেবদাসের মধ্যেও আমরা সেদিন তাঁকে সন্ধান করে ফিরেছি। তাঁর সম্বন্ধে যেখানে যত জনশ্রুতি, সমস্তই সংগ্রহ করে সব কিছুর সাহায্যে তাঁর যে আলেখ্য সেদিন গড়ে তুলেছিলাম বলা বাহুল্য আসলের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোনো মিলই ছিল না।

শুনেছিলাম তিনি শিবপুরে থাকেন। গঙ্গার ওপারে নয় শিবপুর তখন সাত সমুদ্র তের নদী পার বলেই মনে হয়েছিল। তবু অগ্রজস্থানীয় আর একজন ভক্তের সঙ্গে সাহস করে ঠিকানা খুঁজে একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে একটি সাধারণ গলির মধ্যে পুরানো একটি একতলা বাড়ি। শরৎচন্দ্রের ওপর আমাদের মতো কৌতূহলী ভক্তদের উপদ্রব তখন বোধহয় ভালোভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে, তবু অজ্ঞাত অখ্যাত একটি যুবক ও একটি কিশোরকে তিনি বিরক্ত না হয়েই ভেতরের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার অগ্রজস্থানীয়ের কি

দু'চারটি কথা হয়েছিল তা ঠিক স্পষ্ট মনে নেই কারণ মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি তখন সেই আশ্চর্য মানুষ ও তাঁর পরিবেশটিই লক্ষ্য করতে তন্ময়। শরৎচন্দ্রের সেই প্রথম দেখা চেহারা ও তাঁর ঘরের ছবি এখনো মনের মধ্যে মুদ্রিত হয়ে আছে। স্বল্প পরিসর একটি ঘর টেবিল চেয়ারের কোনো বালাই নেই। মেঝেতে শতরঞ্চি বা কম্বলের ওপরেই গেরুয়া চাদর পাতা। মেঝের ওপরেই নিচু একটি ছোট সেল্‌ফে অনেকগুলি বই। তার অধিকাংশই বিজ্ঞানের। সবচেয়ে যা আশ্চর্য করেছিল তা হ'ল দেয়ালে টাঙানো একটি বড় বন্দুক ও তার পাশে একটি রুদ্রাক্ষের মালা।

শুধু তাঁর বসবার ঘরের উপকরণে নয়, তাঁর সম্বন্ধে প্রচলিত তখনকার সত্য মিথ্যা সমস্ত আজগুবি গল্পে এবং তাঁর নিজের রচনাতেও এই আপাত বৈসাদৃশ্যই পাঠক সাধারণের বিস্ময় ও ঔৎসুক্য সেদিন তীব্রভাবে জাগিয়ে তুলেছিল।

আজ বহু বৎসর হয়ে গেল আমরা তাঁকে হারিয়েছি। নানাদিক থেকে সংগৃহীত হয়ে তাঁর জীবনের মোটামুটি একটি ধারাবাহিক চিত্র আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহিত্যের এই রহস্যময় মানুষটি সম্বন্ধে আমাদের বিস্ময় ও কৌতূহলের আজও যে অন্ত নেই তার কারণ সাধারণ যে কোনো একটি ছাঁচে যাঁকে ফেলা যায় সে জগতের মানুষ তিনি ছিলেন না। এমন কি শুধু বাইরের ঘটনাগুলি নির্ভুলভাবে জেনেও তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করা

বৃথা। বাইরের দিক থেকে যা জানা গিয়েছে সাধারণ যে কোনো সাহিত্যিকের তুলনায় সে জীবন যথেষ্ট বিচিত্র। হুগলি জেলার একটি গ্রামে তাঁর জন্ম। জন্ম থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় তাঁর হয়েছে। নিজের গ্রাম ছেড়ে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে তাঁকে পড়াশুনার জন্যে যেতে হয়। কল্পনাপ্রবণ দুঃসাহসী ছেলের বৈশিষ্ট্য তাঁর সেখানকার বহু কীর্তিকলাপেই পরিস্ফুট। ভাগলপুর থেকে আবার তাঁকে নিজের গ্রাম দেবানন্দপুরেই ফিরে আসতে হয়। যে বাউণ্ডুলে বিবাগী মন তাঁকে পরবর্তী জীবনে সুদূর বর্মায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল যৌবনের আগেই তার পরিচয় বহুবার পাওয়া গিয়েছে। বাড়ি থেকে পালিয়ে পথে বিপথে ঘোরা তাঁর বিলাস ছিল। স্রোত যেখানে শান্ত ও মন্থর সেখানে সাধারণ বাঁধা খাতে তাকে অনায়াসে প্রবাহিত করা যায়, কিন্তু বন্যার দুরন্ত বেগকে সঙ্কীর্ণ শাসনের বাঁধ বেধে কে আটকে রাখবে? শরৎচন্দ্রের তখনকার জীবনের সমস্ত ঘটনাতেই এই উদ্দাম প্রাণবন্যার পরিচয়। একদিন বাংলা সাহিত্যকে যা অভাবনীয়রূপে উর্বর করে দিয়ে যাবে, সেদিন তা সমস্ত গণ্ডি তুচ্ছ করে পথ খুঁজে ফিরছে। এই দুরন্ত প্রাণ স্রোতে সাহিত্যের প্রথম প্রেরণা কি করে এল তাঁর ভাষাতেই তা বলছি—"ছেলেবেলার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাকরেদি করি, তার আনন্দ ও আরামে যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা

কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই—ঠিক বিশ্ব কবির নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হ'লে আবার একদিন ক্ষত বিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হ'লে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন, সেখানে আর একদফা সম্বর্ধনা লাভের পর আবার পড়াশুনায় মনোনিবেশ করি। কিন্তু আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি ও দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে। আবার সাকরেদি শুরু করি। আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা আবার ফিরে আসা আবার তেমনি আদর আপ্যায়ন সম্বর্ধনার ঘটা। এমনি করে বোধোদয় পদ্যপাঠের সঙ্গে বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সাঙ্গো হ'ল।"

তারপরে তিনি এলেন শহরে। একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা তাঁকে ভর্তি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাশে। তাঁর পাঠ্য সীতার বনবাস চারুপাঠ সদ্ভাব সদগুরু ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয়, বা মাসিক সাপ্তাহিক সমালোচনা লেখা নয়। এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে যে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তিনি লিখেছেন···"তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোনো উদ্দেশ্য আছে।

"যে পরিবারে আমি মানুষ সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সংগীত অস্পৃশ্য। সেখানে সবাই চায় পাশ করতে

এবং উকিল হতে।...কিন্তু হঠাৎ এর মাঝেও বিপর্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন। তিনি এলেন বাড়ি।...বাড়ির মেয়েদের জড়ো করে তিনি একদিন পড়ে শোনালেন, রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'! কে কতটা বুঝলে জানি না কিন্তু যিনি পড়েছিলেন তাঁর সঙ্গে আমারও চোখে জল এল। কিন্তু পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায় এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম।..."

শুধু প্রথম সাহিত্যরস সঞ্চয়ের দিক দিয়ে নয় শরৎচন্দ্রের চরিত্রের কিছুটা আভাস পাবার পক্ষেও এই কাহিনীটুকুর মধ্যে একটি ইঙ্গিত লক্ষ্য করবার মতো।

গেরুয়া চাদরের পাশে বৈজ্ঞানিক বই এবং বন্দুকের পাশে রুদ্রাক্ষের মালা দেখে একদিন যখন শুধু আশ্চর্য হয়েছিলাম তখন বুঝিনি এই আপাত অসঙ্গতির মধ্যেই শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য সাধনার সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে।

রাতারাতি একটা সমগ্র দেশের হৃদয় জয় করা সত্যই অলৌকিক ব্যাপার। সাহিত্যের ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল। তাই কোন যাদুমন্ত্রে কি অপূর্ব কৌশলে শরৎচন্দ্র সাহিত্যে আবিভূত হয়েই সকলকে এমন করে বশ করে ফেলেছিলেন জানতে ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। গল্প-উপন্যাস আরো অনেকে লিখেছেন, এবং ভালোই লিখেছেন কিন্তু এত সহজে আর কেউ সাধারণের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশের অধিকার পান নি। বাঙালীর জন্যে শরৎচন্দ্র এমন কি

অপরূপ উপহার এনেছিলেন। সে কি অশ্রুতপূর্ব গল্প, শুধু কি অদৃষ্টপূর্ব চরিত্র, শুধু কি লেখবার অননুকরণীয় ভঙ্গি? শুধু মানুষের জীবন সম্বন্ধে গভীরতম অন্তর্দৃষ্টি? লেখবার অননুকরণীয় ভঙ্গি বা মানুষের হৃদয় সম্বন্ধে গভীর অন্তর্দৃষ্টি কিছুরই তাঁর অভাব ছিল না কিন্তু মায়াবী লেখক হিসাবে তাঁর কল্পনাতীত সার্থকতার প্রধান কারণ এই যে তাঁর রচিত জীবনমুকুরে বাংলা দেশ যেন তার আত্মাকে দেখতে পেয়েছে।

বিশেষ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ মানুষের সমষ্টি মাত্রেই জাতি নয়। রাজনৈতিক ঐক্য শিল্পবাণিজ্যের যোগসূত্র এবং বাহ্যিক স্বার্থের বন্ধনেও সত্যকার জাতি গড়ে ওঠে না। মানুষের ইতিহাসে সেই জাতির মূল্য আছে বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় যে জাতি জীবনকে গ্রহণ ও সার্থক করবার একটি বিশেষ ভঙ্গি একটি বিশেষ দর্শন গড়ে তুলেছে। পুঁথির পাতার ন্যায়শাস্ত্র-শাসিত দর্শন এ নয়। জাতির রক্তের ধারায় এ জীবন-দর্শন মিশে থাকে।

জীবনকে ধন্য করবার আমাদেরও এমনি একটি অনন্যসাধারণ ভঙ্গি আছে। না থাকলে জাতি হিসাবে তার কোনো সার্থকতাই থাকতো না। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্র গভীরভাবে তা উপলব্ধি করে ভাষায় তাকে রূপ দিলেন।

কিন্তু দেশের অন্তর লোককে তিনি শুধু মাধুর্যের প্রলেপে মুগ্ধ করেছেন একথা ভাবার মতো ভুল আর কিছু হ'তে পারে

না। হৃদয় বিগলিত করার যাদুমন্ত্রই শুধু তাঁর জানা ছিল না, আমাদের মনকে অপ্রীতিকর সত্যের সম্মুখীন করে দেবার সাহসের কোনোদিন তাঁর অভাব হয় নি। বিন্দুর ছেলে রামের সুমতির সঙ্গে বামুনের মেয়ে লিখতে তিনি দ্বিধা করেন নি, পরিণীতা যেমন, তেমনি গৃহদাহও রচনা করেছেন, দত্তার সঙ্গে দেনাপাওনার হিসাব দেখাতেও ভোলেন নি। তাঁর করুণাস্নিগ্ধ লেখনী একদিকে যেমন আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের মাধুর্যকে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে নতুন করে ফুটিয়ে তুলেছে আরেকদিকে তাঁর বিদ্রোহী প্রকৃতি তেমনি অসত্য অন্যায় ও গ্লানির প্রতি আমাদের মনের নিশ্চেষ্ট ঔদাসীন্যের ওপর নির্মম কশাঘাত করেছে। বহু মধুর সমাধানের আশ্চর্য ইঙ্গিত আমরা যেমন তাঁর কাছে পেয়েছি, তেমনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত সুতীক্ষ্ণ প্রশ্ন তিনি সাহিত্য জীবনে নির্ভীক ভাবে তুলে ধরেছেন তার কথা যদি আমরা ভুলে যাই তাহলে তাঁর স্মৃতির যথার্থ মর্যাদা আমরা দিতে পারবো না।

দুটি মৃত্যু

প্রায় এক সঙ্গে দুটি মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছোলো। একটি মৃত্যুর আঘাত সমস্ত পৃথিবীর বুকে বাজবে আর একটির আঘাত এখনো বাঙলাদেশের বাহিরে বোধ হয় পৌঁছোবে না। তবু পৃথিবী জোড়া যাঁর খ্যাতি, এ যুগের চিন্তায় ভাবনায় সাধনায় নিজের তপস্যার দান যিনি মিশিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সেই বার্নার্ড শ'র চেয়ে একান্তভাবে আমাদের বাঙলার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রত্যাশিত আকস্মিক বিয়োগ-ব্যথা যদি আমাদের বেশী বাজে তাতে বোধ হয় অবাক হবার কিছু নেই।

সুপরিণত চুরানব্বুই বৎসর বয়সে বার্নার্ড শ'র মৃত্যু ঠিক দুঃখের বলতে বোধ হয় পারি না, সে মৃত্যু যেন কতকটা আমাদের পরাজয়। সমগ্র মানব জাতি যেন তাঁর মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে পরাস্ত করার অসাধ্য সাধনায় নিজেকে জড়িত করে রেখেছিল। বার্নার্ড শ'র দেহাবসান তাই আমাদের কাছে যতখানি দুঃখের তার চেয়ে বেশী হতাশার—যে হতাশার কোনো প্রতিকার নেই আমরা জানি।

বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয় যার আছে বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আকস্মিক অকালমৃত্যু তাকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে স্পর্শ করে স্তব্ধ অভিভূত করে দেবে।

দুটি মৃত্যু

অনেক আশ্চর্য প্রতিভার দানে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ, কিন্তু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এমন একটি সহজ সরল ভেজালহীন সাহিত্যের মানুষ আগে বোধ হয় কখনও দেখা যায় নি।

ব্যক্তিগত পরিচয় তাঁর সঙ্গে যাদের হয় নি, সাহিত্য থেকে তাঁর যে চেহারা তারা পায় আসলের সঙ্গে খুব বেশী তফাৎ তার নেই। সাহিত্যে ও জীবনের মধ্যে কোনো কৃত্রিম সীমারেখা তাঁর ছিল না বলেই তিনি সর্বত্র একই রকম সরল সহজ অন্তরঙ্গ নিরভিমান সদানন্দ পুরুষ।

গভীর লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে, মুখের পরিচয় অনেক আগে থেকে থাকলেও জীবনে ও সাহিত্যে এই আশ্চর্য সিদ্ধ মানুষটিকে আবিষ্কার করেছি অনেক পরে। চেহারায় পোষাকে এবং ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক চরিত্রে কোথাও চোখ ধাঁধানো বাহ্যিক চাকচিক্য তাঁর ছিল না। কিন্তু সেই কারণেই তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়ে নি একথা বলাও ঠিক হবে না। বাইরের চটকের প্রতি বিশেষ মোহ কখনো ছিল বলে মনে করতে পারি না। তাঁকে যে গোড়ায় চিনতে পারি নি তার কারণ কি লেখক মানুষ হিসেবে তিনি যে জাতের লোক ছিলেন ক্ষণিক ভাসাভাসা পরিচয়ে তার সম্পূর্ণ মূল্য বোঝা সম্ভব নয়।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় অখ্যাত অবহেলিত লেখক নন কিন্তু তবু তাঁর সত্যকার গভীর পরিচয় এখনো আবিষ্কারের

৫

অপেক্ষায় আছে বলে মনে করি। আমার নিজস্ব লজ্জার এইটুকুই সান্ত্বনা।

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করলে পথের পাঁচালীর কথাই বোধ হয় সকলের সবার আগে মনে পড়ে। আবার পথের পাঁচালী বলতেও প্রথমে বোধ হয় সে কাহিনীর মানুষজনের চেয়ে বাংলাদেশের গ্রাম প্রকৃতি ও গাছপালার বিস্তারিত সানুরাগ বিস্ময় মধুর বর্ণনার কথাই বেশী করে মনে আসে।

বাংলার মাঠ-ঘাট বন যে আমাদের এত অচেনা বিভূতিভূষণের আগে কেউ এমন করে বোধ হয় বুঝিয়ে দেন নি।

পথের পাঁচালীর গল্পাংশ চমৎকার কিন্তু বিভূতিভূষণের সাহিত্যিক খ্যাতির প্রথম প্রতিষ্ঠা সে গল্পের ওপরে নয় তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রকৃতি-বর্ণনার অভিনবত্বের ওপরে।

বাংলার গ্রাম্য প্রকৃতিকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখার নিজস্ব ভঙ্গিটি বিভূতিভূষণের লেখায় গোড়া থেকেই অবশ্য দেখা গিয়েছিল।

অনেক দিন আগের কথা। নিজের সাহিত্য-জীবন তখনও শুরু হয় নি। প্রবাসী পত্রিকা স্বর্গতঃ চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রতি বৎসর গল্প প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে যে সব গল্পকে পুরস্কৃত করতো সাগ্রহে সেগুলি পাঠ করতাম। তার মধ্যে 'মৌরী ফুল' নামে একটি গল্প মনের ওপর বেশ একটু রেখাপাত করেছিল। গল্প

লেখকের নাম লক্ষ্য করবার মতো কৌতূহল তখন হয়তো ছিল না, গল্পটিও যে খুব অদ্ভুত লেগেছিল তাও বলতে পারি না, কিন্তু গল্পের কাহিনীটি পড়ে ভুলে যাওয়ার পরও মনের মধ্যে গ্রাম-পরিবেশের কি এমন একটা অস্পষ্ট অপরিচিত সৌরভ লেগেছিল, বহুদিন বাদেও যা মুছে যায় নি। অনেক পরে যখন জেনেছিলাম সেটি বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তখন পথের পাঁচালীর লেখক হিসাবে তাঁকে নিয়ে সাহিত্যিক জগতে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে।

পথের পাঁচালী নিয়ে সাহিত্য জগতের এই সাড়া পড়া আনন্দের কথা সন্দেহ নেই কিন্তু বাংলার এক অখ্যাত গ্রাম নিয়ে যাঁর পথের পাঁচালী শুরু হয়েছিল, শুধু গ্রাম্য-প্রকৃতির অভূতপূর্ব বর্ণনাতেই তাঁর শক্তি যে সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর পথ যে আরো বহুদূর তাঁকে নিয়ে গিয়েছে সে তথ্য অনাবিষ্কৃত থাকাও বড় দুঃখের কথা। তাঁর সহজ কৃতিত্ব তাঁর সত্যকার কীর্তিকে অনেকের কাছে এখনো আড়াল করে আছে।

প্রকৃতিকে শুধু নয় মানুষকেও বিভূতিভূষণ এমন এক অভিনব দৃষ্টিতে দেখেছেন যার স্বচ্ছ সারল্য নিপুণতম অনেক লেখকের বর্ণাঢ্যতাকে লজ্জা দেয়। এ স্বচ্ছ সারল্য তাঁর নিজের মনেরই প্রতিবিম্ব। তাঁর মনে কবির অনন্ত বিস্ময় ও বৈজ্ঞানিকের কঠিন সততার সঙ্গে সন্ন্যাসীর নির্বিকার প্রশান্তির এমন একটি আশ্চর্য সমাবেশ ছিল, আমাদের দেশের কেন, যে কোনো দেশের সাহিত্যে যা দুর্লভ। তাঁর সার্থকতম লেখাগুলি তাই সাধারণ সাহিত্যের চেয়ে

আরো বেশী কিছু—তার রসোপলব্ধির অধিকারী সকলে হয় না।

অন্য সব সাধনার মতো সাহিত্যেও একটা স্থলভ সিদ্ধির স্তর আছে। চটকদার কৌশল ও কারসাজি নিয়ে যেখানে কারবার, নগদ পুরস্কারের লোভে সেখানেই অনেকে আটকা পড়ে থাকেন। সে মরীচিকা-মরু ক্লান্ত পদে যারা পার হয়ে আসে বিভূতিভূষণের মতো সাধু-সাহিত্যসঙ্গমে অবগাহন করার সৌভাগ্য শুধু তাদেরই।

বিভূতিভূষণ সম্বন্ধে যা এখনো আমাদের আবিষ্কার করবার আছে তা তাঁর বর্ণনার বিশেষত্ব নয়, তাঁর উপলব্ধির গভীরতা। মনের বহু কৃত্রিম আবরণ এক এক করে সরে না গেলে সৃষ্টি ও জীবন, মানুষ ও প্রকৃতিকে এমন সহজ অথচ সবিস্ময় দৃষ্টিতে দেখা যায় না।

সর্বশেষ বিশ্লেষণে মিথ্যার চেয়ে সত্য অনেক বেশী রঙিন অনেক বেশী রহস্য-গভীর।

বিভূতিভূষণের স্বচ্ছ নির্মল মন সত্যের সেই বিস্ময় দীপ্তিতেই সর্বত্র উদ্ভাসিত। তাঁর লেখায় বাইরের দৌড় ঝাঁপ কোথাও নেই, আপাত দৃষ্টিতে তা মন্থর, কিন্তু নিরলস সত্য সন্ধানীর চির রোমাঞ্চকর অভিযানের উন্মাদনা তা আমাদের মনে কি যাদুতে যেন সঞ্চারিত করে দেয়।

পর্যটনই পথের পাঁচালীর লেখকের জীবনের ব্রত। শুধু এক জীবনে নয় জন্ম থেকে জন্মান্তরে অন্তহীন পর্যটনে তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন। লবটুলিয়া বইহারের নির্জন

অরণ্য ভূমিতে বসে একদিন তিনি অনুভব করেছিলেন—যেন এই নিস্তব্ধ নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্যের জন্ম, নানা নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। "শুধু যে-আত্মা নিরলস অবকাশ যাপন করে, জ্ঞানের আকণ্ঠ পিপাসায় যার প্রাণ বিশ্বের বিরাট ও ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে সচেতন আনন্দে উল্লসিত—জন্মজন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূর যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র তুচ্ছ বর্তমানের দুঃখ শোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিয়াছে—সেই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়।"

সৃষ্টির রহস্যরূপ-সন্ধানী সেই চির-পরিব্রাজককে জন্ম জন্মান্তরের পথে আমাদের বিয়োগ-বেদনা নয় অভিনন্দন জানাই।

সমারসেট মম্

সমারসেট মম্ জাতিতে ইংরেজ কিন্তু সাহিত্যিক প্রকৃতিতে ফরাসী বললে খুব ভুল বোধহয় করা হয় না। তাঁর সমসাময়িক সাহিত্যিকদের সঙ্গে এক গোত্রে অন্তত তাঁকে একেবারেই ফেলা যায় না। আর্নল্ড বেনেট, ওয়েলস ও গলসওয়ার্দির সঙ্গে একই যুগের হাওয়ায় তিনি নিশ্বাস নিয়েছেন, তবু ইংরেজের শাঁসালো ভারের চেয়ে ফরাসীর উজ্জ্বল ধারই তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বেশি। তাঁর রচনায় সূক্ষ্ম বিদ্রূপের ধার; ধার—ঘোরালো অথচ তীব্র শ্লেষের, ধার—কখনো সোনার খাদটুকু ধরিয়ে দিয়ে, কখনো খাদের সোনাটাকে বুঝিয়ে দিয়ে ঈষৎ বাঁকা হাসির। তবু সে হাসি শুধু বাঁকা নয়, পরম প্রিয়জনকে নিষ্ঠুর অপ্রিয় সত্য শোনাতে বাধ্য হওয়ায় কেমন একটু কুণ্ঠিত ও করুণ।

মম্-এর লেখা পড়তে পড়তে পূর্বসূরীদের কাউকে যদি মনে পড়ে, তাহলে তাঁরা হলেন মোপাসাঁ, দোদে, ফ্লবেয়ার। তাঁর রচনার বুনন তেমনি সূক্ষ্ম, সরল, বাহুল্যবর্জিত কিন্তু সম্পূর্ণ নক্সা যেখানে শেষ হয় সেখানকার অপ্রত্যাশিত বিস্ময় একেবারে মর্মে গিয়ে লাগে। এই কঠিন বাকসংযম, আঙ্গিকের এই বিশুদ্ধ সারল্য ইংরাজি সাহিত্যের ঠিক ধাতস্থ নয়, তাই সমারসেট মম্কে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা পাবার জন্য

বহুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে। পল্লবগ্রাহিতার অপবাদে কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে জাতে ঠেলে রাখতে দ্বিধা করেননি। গল্পকারের বিজয় মালা নিতে তাঁকে প্রথমে রঙ্গমঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলোয় নাট্যকাররূপে নিজেকে পরিচিত করতে হয়েছে।

'ধার'টুকুর দিক দিয়ে মোপাসাঁর সঙ্গে মিল থাকলেও মম্‌কে সেই সুবিখ্যাত 'সিনিক'-এর সাহিত্য-বংশধর ভাবলে অত্যন্ত ভুল করা হবে।

সুধার পাত্র ভ্রমে গরল মুখে তুলে যাঁদের সমস্ত মন বিষাক্ত হয়ে যায় ও পৃথিবীর সবকিছুকে যাঁরা তিক্ত অবিশ্বাসের চোখে দেখেন, মম্ তাঁদের দলের নন। জীবনের বিষামৃত দুই-ই স্বীকার করবার মতো মনের উদার সরসতা তাঁর আছে।

অস্ত্রচিকিৎসকের ছুরিকার মতো তাঁর কলমের ডগায় শ্লেষের নির্মমতাই প্রথমে চোখে পড়ে, তাঁর করুণা ও বেদনা থাকে নেপথ্যে।

জীবনের কোনো অসুস্থতা, অস্বাভাবিকতা, গ্লানি, ক্লেদ, আত্মপ্রবঞ্চনাকে তিনি দুর্বল ভাবালুতায় ক্ষমা করেননি, মিথ্যাকে কখনো রঙিন করে তোলেননি অলীক স্বপ্নের জাল বুনে।

প্রথম জীবনের ডাক্তারি-পড়া তাঁর একদিক দিয়ে সম্পূর্ণ সার্থক। শুধু দেহের ব্যাধির চিকিৎসায় সন্তুষ্ট থাকবার মতো প্রতিভা অবশ্য তাঁর নয়, কিন্তু বিচক্ষণ চিকিৎসকের তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ

দৃষ্টি দিয়েই তিনি জীবনের বিচিত্রলীলা পর্যবেক্ষণ করেছেন। সমস্ত বাহ্যিক ভাব ও আচরণ ভেদ করে ব্যাধি ও বিকৃতির মূলে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি পৌঁচেছে। তাঁর শাণিত শ্লেষ নির্ভুল ভাবে সমস্ত ছলনার আবরণ ছিন্ন করে দিয়েছে।

কি রাষ্ট্রে সমাজে, কি ব্যক্তিগত জীবনে, মানুষের আত্মপ্রতারণার আর অন্ত নেই। লেখায় সেই আত্মপ্রবঞ্চনার খোরাক যুগিয়ে আমাদের দুর্বলতার খোশামুদি যাঁরা করেন, সাহিত্যের বাজারে নগদ খ্যাতির মূল্য তাঁদের অত্যন্ত সহজেই মেলে। কিন্তু এই সহজসিদ্ধির পথ মম্-এর নয়। সিনিক-এর অপবাদ অগ্রাহ্য করে তিনি অবিচলিত ভাবে জীবনের জটিলতার যথার্থ পরিচয় দেবার চেষ্টা করে গিয়েছেন সর্বত্র। আমাদের সমস্ত আত্মবঞ্চনা তাঁর অভ্রান্ত কলমের কাছে যেমন ধরা পড়েছে, আকাশ-কুসুমকে সত্য করে তোলার চেষ্টায় আমাদের ব্যর্থতার করুণ মহিমাও তেমনি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি।

মম্-এর জীবনে অভিজ্ঞতার গভীরতা আপাত-দৃষ্টিতে যাদের চোখে ধরা পড়ে না তারাও তাঁর ব্যাপকতায় বিস্মিত না হয়ে পারে না। সমাজ-জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে পৃথিবীর দূরদূরান্তরের সমস্ত দেশের জীবনযাত্রা যেন তাঁর নখদর্পণে। মেক্সিকোর গুয়াতেমালা থেকে পলিনেশিয়ার যে কোনো দ্বীপে তাঁর সচ্ছন্দ অবাধ গতি। প্রশান্ত মহাসাগরের সুবিশাল পটভূমিকাতেই বেশির ভাগ কাহিনী তাঁর রচিত। মানুষের মন ও চরিত্রের জটিলতার সূত্র নিপুণ

হাতে খুলতে খুলতে সামান্য দু'চারটি টানে সেই বর্ণাঢ্য পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার মুন্সিয়ানায় তাঁর জুড়ি মেলা ভার।

তবু বাইরের প্রকৃতি নয়, মানুষের মনই তাঁর আসল বিষয়বস্তু। বর্ণের বৈচিত্র্যে, রহস্যের নিবিড়তায়, মানুষের মনের কাছে প্রকৃতিকে হার মানিয়ে লজ্জা দেবার জন্যই যেন তিনি তাঁর সবচেয়ে রঙিন জমকালো রূপ বেছে নিয়েছেন।

মম্-এর গল্পগুলি আশ্চর্য, অপরূপ, অসংখ্য চরিত্রের অফুরন্ত এক প্রদর্শনী। কত বিচিত্র মানুষই না সেখানে ভিড় করে আছে। মম্-এর নিপুণ তুলিকার টানে তাদের প্রত্যেকের প্রচ্ছন্ন রহস্য অপ্রত্যাশিত ভাবে উদ্ঘাটিত।

লেখার ভেতর দিয়ে লেখককে আবিষ্কার করা যদি সম্ভব হয়, তাহলে বলতে পারি মম্‌কে এই সব চরিত্রের নিয়তির নির্মম নির্বিকার বিধাতা শুধু মনে হয় না। মনে হয়, জীবনের চোরাবালিতে মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্খলন-পতনের নিরপেক্ষ নির্লিপ্ত ইতিহাস রচনা করেই নিজেকে খালাশ মনে করতে তিনি পারেননি, শ্লেষের হাসি দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ অসহায় মানুষের লাঞ্ছিত সত্তার জন্য মনের নেপথ্যে একটি বিমূঢ় নিরুপায় বেদনাই তাঁর আছে। 'বৃষ্টি' গল্পটির গোঁড়া সংকীর্ণ চিত্ত পাদ্রীসাহেব অক্ষমতর লেখকের কলমে শুধু আমাদের বিদ্বেষ জাগিয়েই বিদায় নিতো হয়তো, কিন্তু প্যাগো-প্যাগোর সমুদ্র-সৈকতে তাকে ঘৃণাভরে ফেলে আসতে আমরা পারি না। সমস্ত বাহ্যিক বিদ্রূপ

অতিক্রম করে তার অন্ধ শৃঙ্খলিত মনের চরম লাঞ্ছনা ও হতাশায় মম্‌-এর প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি আমাদেরও স্পর্শ করে।

সমারসেট মম্‌ জীবনে নাটক, উপন্যাস গল্প লিখেছেন প্রচুর। তার সব ক'টিই তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভায় সমুজ্জ্বল। একটি বিশেষ কারণে 'শাস্তির ভরা' গল্পটি উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়। বিচক্ষণ সমালোচকদের মতে ইংরাজি সাহিত্যে একদিক দিয়ে এমন কৌতুকময় উদ্ভট ও অপরদিক দিয়ে এমন নিদারুণ বিদ্রূপাত্মক কাহিনী কোনোদিন লেখা হয় নি। বিগতযৌবনা শ্রীহীনা ধর্মান্ধ একটি মহিলা, আর অধঃপাতের অতল পঙ্কে নিমগ্ন এক অপদার্থের জীবন নিয়ে নিয়তির পরিহাসের এ কাহিনী শুধু মম্‌-এর তির্যক কল্পনাতেই সম্ভব।

ডি. এইচ. লরেন্স

ইংরাজি সাহিত্য-ক্ষেত্রে লরেন্স-এর আবির্ভাব, ইংলণ্ডের হিমেল আবহাওয়ায় সূর্যতপ্ত গরম দেশের গাঢ় সবুজ রহস্য-নিবিড় বর্ণসমারোহময় অরণ্যের দেখা পাওয়ার মতোই অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর। মনের মেঘ-লোক যাঁরা ছাড়িয়ে উঠেছেন, এমন বহু বিরাট দিক্‌পাল ইংরাজি সাহিত্যে আছেন, কিন্তু লরেন্স ঠিক যেন তাঁদের জাতের নয়। মনের দিক দিয়ে সুমেরু বৃত্তের চেয়ে বিষুব রেখার যেন তিনি বেশি কাছাকাছি। আগ্নেয়গিরির দুরন্ত তীব্র উত্তাপ তাঁর ভাষায়, তাঁর মনে রৌদ্রোজ্জ্বল বিচিত্র রঙের কুণ্ঠাহীন প্রাচুর্য। ইংলণ্ডের অপেক্ষাকৃত শান্ত গম্ভীর বনেদীচালের সাহিত্যের জগতে তিনি কিছুদিন বজ্রঘোষিত বিদ্যুত-কশায়িত মৌসুমী ঝড়ের মতো বয়ে গিয়েছেন।

কয়লার খনির এক শ্রমিকের ঘরে ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর লরেন্স-এর জন্ম হয়। বাপ-মায়ের তিনি চতুর্থ সন্তান। নিজের চেষ্টায় যথাসাধ্য লেখাপড়া করে অল্প বয়সেই তাঁকে কাজে বেরুতে হয়। সতরো থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত খনির শ্রমিকদের একটি প্রাথমিক পাঠশালায় তিনি শিক্ষকতা করেন; তার পরের দু'বছর কাটান নটিংহ্যাম

বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে বেরিয়ে ক্রয়ডনের একটি স্কুলে মাস্টারি করবার সময় তাঁর অনুরাগিণী এক বান্ধবী তখনকার ইংলিশ রিভিউ কাগজের সম্পাদক ফোর্ড ম্যাডক্স হুয়েফারের কাছে তাঁর কয়েকটি কবিতা পাঠান। ফোর্ড ম্যাডক্স হুয়েফারই এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রতিভার অসামান্য দীপ্তি দেখে লরেন্স-এর সাহিত্য-জগতে প্রবেশের সহায় হন।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ১৯৩০ সালের ৩রা মার্চ লরেন্স মারা যান। স্বল্পায়ু জীবনে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা বেশ প্রচুরই তিনি লিখে গিয়েছেন। ভাষা, ভঙ্গী বিষয়-বস্তুর অভিনবত্ব সব দিক দিয়েই তাঁর রচনা ইংরাজি সাহিত্যে একটি বিশেষ অধ্যায় সৃষ্টি করে গিয়েছে। তবু শুধু সাহিত্যের কষ্টিপাথরে তাঁর সমস্ত রচনার সম্পূর্ণ মূল্য বোধ হয় কষে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস The White Peacock থেকে, তাঁর শেষ রচনা The Escaped Cock পর্যন্ত যে জ্বলন্ত প্রচণ্ড সৃষ্টি-প্রবাহ আমরা অনুভব করি, তা বিশুদ্ধ শিল্প-নিষ্ঠ সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা নয়। সৃষ্টির রহস্য-মর্ম-সন্ধানী সাধকের তৃপ্তিহীন জীবন-জিজ্ঞাসাই নানা ছন্দে নানারূপে তাঁর রচনার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

জীবনের বিপুল বিচিত্র প্রকাশ থেকে নিজের খেয়াল খুশি ও মতলব মাফিক টানাপোড়েনের নক্সা বুনে তোলাতেই যাদের তৃপ্তি, লরেন্স ঠিক সেই জাতের সাহিত্যিক নন, তাঁর চোখে সেই তীক্ষ্ণ মর্মভেদী দৃষ্টি, অর্ধ-সত্য-বিড়ম্বিত আমাদের

কুয়াশাচ্ছন্ন বাহ্যিক সচেতনার পর্দা যার কাছে আপনা হতে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়—তাঁর অন্তরে ঋষিমনের সেই অনির্বাণ প্রচণ্ড আকুতি জীবনের নিরুদ্দেশ নিরর্থক আবর্তকে যা সত্যকার কেন্দ্রনিষ্ঠ করে সার্থক করে তুলতে চায়। জীবন-জিজ্ঞাসার দুর্গম, বন্ধুর গোলকধাঁধার মতো জটিল পথ তিনি যেমন অতিক্রম করে গিয়েছেন, তাঁর আত্মোপলব্ধির ইতিহাস নানা রচনায় তেমনি স্মারক-চিহ্ন হিসাবে পথের ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

লরেন্স-এর জীবন-জিজ্ঞাসা অবশ্য সহজ সর্বজন-বোধ্য নয়। যৌন-মিলন সম্বন্ধে তাঁর যে তন্ময়তা সাধারণ পাঠকের অগভীর দৃষ্টি প্রথমেই আকর্ষণ করে, তাঁর আত্মানুসন্ধানের অভিযানকে যথার্থ প্ররিপ্রেক্ষিতে দেখবার পক্ষে তা যথেষ্ট অন্তরায়। এক হিসেবে লরেন্স-এর সমস্ত রচনার মূলেই যৌন-মিলনের প্রসঙ্গ প্রধান হয়ে আছে এ কথা সত্য। কিন্তু যৌন-মিলন বলতে তিনি যা বোঝেন, দেহসম্ভোগের সংকীর্ণ সংজ্ঞা ছাড়িয়ে জীবনের রহস্য-গভীর আর এক অতলতায় না পৌঁছলে তার সত্যকার অর্থ মেলে না।

আমাদের এই পরমাশ্চর্য চেতনার দীপ দেহাধারেই প্রজ্জ্বলিত। তাই দেহাতীত অবাস্তব আবছা কোনো আদর্শ-বাদের আলেয়ায় দিকভ্রান্ত না হবার পণ করে জীবনের আর এক ধ্রুব ভিত্তি তিনি সন্ধান করে ফিরেছেন; এই দেহাশ্রয়ী কামনারই দুরবগাহ রহস্য-কেন্দ্রে মানুষের সূর্য-সত্তা আবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

ইউরোপের এই নব্য তান্ত্রিক হয়তো ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট। তিনি সত্যদ্রষ্টা কি না সে বিচারের ভার আমাদের ওপর নেই। আত্মোপলব্ধির পথে তাঁর দীপ্যমান মনের যে আলো সাহিত্যের জগতে এসে পড়েছে, আমাদের কাছে তাই সব চেয়ে মূল্যবান।

উপন্যাসের বিস্তৃত ক্ষেত্রে তাঁর শিল্পীমন জীবন-জিজ্ঞাসার আবেগ-প্রবাহে অনেক জায়গাতেই ভেসে গিয়েছে, প্রচারকের উদ্দীপনা শিল্প-সীমার সম্মান রাখার বিশেষ প্রয়োজনই সেখানে অনুভব করেনি। কিন্তু ছোট গল্পের অপরিসর সীমার মধ্যে তাঁর শিল্পীমন অনেক বেশি সজাগ। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসের মতো তিনি নিজেই ভিন্ন ভিন্ন নামে এ সমস্ত গল্পের নায়ক নন। এখানে যাদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, তারা কেউই সাধারণ কাহিনীর জগতের মামুলী চরিত্র অবশ্য নয়, তবু অচেনা অবাস্তবও তাদের মনে হয় না। বরং তুচ্ছ প্রাত্যহিকতার নকল মুখোশ পরে আমাদের চারিধারে যারা ঘুরে বেড়ায়, ছদ্মবেশ ছাড়িয়ে তাদেরই সত্যকার রূপ যেন লরেন্স প্রকাশ করে দিয়েছেন। লরেন্স-এর কাহিনীর ধারা-নিয়ন্ত্রণের নিয়তিও একেবারে আলাদা। মামুলী গল্পের হাসিকান্নার দোলায় দোলানো চিরাচরিত বিন্যাস সে জানে না। সাধারণ বিরহ-মিলন, সুখ-দুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতায় আলো-ছায়ার নক্সা কাটা কাহিনী-বিন্যাসে মুখে একটু হাসি ফোটাবার, কি চোখ একটু অশ্রুসজল করবার দায় নিয়ে লরেন্স গল্প লিখতে বসেননি।

ডি এইচ লরেন্স

কোষ-মুক্ত তরবারির মতো উজ্জ্বল, নিরাবরণ তাঁর সমস্ত চরিত্র দুর্জ্ঞেয় এক শিল্প নিয়তির নির্দেশে আমাদের অগোচর মনের অনাবিষ্কৃত সমস্ত কোণে অদ্ভুত অনুভূতির বিদ্যুৎ স্পর্শ রেখে যায়।

কুড়েমি

আত্মপ্রচারের অহমিকা থেকে নয় অত্যন্ত অপরাধীর মতো সঙ্কোচভরে আমি স্বীকার করছি আমি অত্যন্ত কুড়ে। আমার কুড়েমির অখ্যাতি বন্ধু-বান্ধব থেকে শুরু করে বাইরের লোকের মধ্যেও কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়েছে। কেজো লোকেরা আমার নামে মুখ বিকৃত করে, বন্ধু-বান্ধবেরা হতাশার নিশ্বাস ফেলে, অনুরাগী যে দু'চারজন আছে তারা বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ে। যারা অভিজ্ঞ তারা আমার সঙ্গে কোনো দেখা শোনার সময় ঠিক করতে এদিকে ওদিকে ঘণ্টা দু'-এক-এর উদ্বৃত্ত আগে থাকতে ধরে রাখে, আমায় কোনো বরাত দেওয়ার বেলা প্রথম থেকেই ব্যাপারটা বাতিল করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকে। সম্পাদকেরা আমার কাছে সময়মতো লেখা পায় না, বন্ধু-বান্ধবেরা পায় না চিঠির জবাব। সদিচ্ছার আমার অভাব নেই—চিঠি পেলেই তার জবাব আমি দেবার জন্য উৎসুক হই, কিন্তু লেখাটা বেশির ভাগ সময়ে মনে মনেই হয়, কলমের মুখে কাগজ পর্যন্ত পৌঁছোয় না। সম্পাদকের তাগাদায় অনেক গল্প আমার কল্পনায় জন্ম নিয়ে সেইখানেই একদিন বিলীন হয়ে গিয়েছে, কম্পোজিটাররা তার পাঠোদ্ধার করে ছাপার হরফে সাজাবার দুর্ভোগ থেকে রেহাই পেয়েছে।

কুড়েমি

আমার এই কুড়েমি নিয়ে আমার মনে কোনো গ্লানি নেই এমন নয়। কুড়েমির দোষ যে কত আমি মর্মে মর্মে বুঝি। দরকারী কাগজপত্র যথাসময়ে যথাস্থানে রাখবার আলস্যের দরুণ ঘণ্টা দুই খুঁজে হয়রান ও হতাশ হয়ে মেজাজ আমার অহরহঃ বিগড়ে যায়,—ধার না করেও শুধু লেখা দেবার প্রতিশ্রুতি না রাখতে পেরে কাগজওয়ালাদের তাগিদে, পাওনাদারদের ভয়ে খাতকের মতো আমায় চোর হয়ে থাকতে হয়। সকালবেলা বেশ নিশ্চিন্ত মনে অর্ধশায়িত অবস্থায় এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতায় পাতায় যথেচ্ছ বিহার করতে করতে (পাণ্ডিত্য অর্জনের উৎসাহে নয়, নেহাৎ অবসর বিনোদনের খাতিকে) চড়ুই পাখীদের পারিবারিক কলহ উপভোগ করছি, এমন সময়ে বাইরে থেকে কার ডাক শোনা যায়। তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। মনে পড়ে এই শাদামেঘের পাল তুলে ভেসে যাওয়া সুনীল দিনটার বিদঘুটে ব্যবহারিক নাম হলো বৃহস্পতিবার এবং এই দিনে সকাল ন'টার সময় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুনীল ধরের কাছে লেখা দেবার জন্যে আমি অঙ্গীকারবদ্ধ। ডাকটা শুনে বেমালুম বিলুপ্ত হয়ে যাবার একটা ক্ষণিক প্রবল বাসনা হয়, ইচ্ছা হয় কাউকে দিয়ে বাড়ি নেই বলে খবর পাঠাই। কিন্তু বন্ধুবর সুনীল ধরের হাত থেকে অত সহজে রেহাই পাওয়া যায় না। একেবারে বাড়ির ভেতর তিনি চড়াও হয়ে এসে পাকড়াও করেন। সুতরাং সত্য মিথ্যা বাস্তব ও কল্পনায় মেশানো নানা কাহিনী তৈরী করে লেখাটা

যথাসময়ে না লিখে উঠতে পারার কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করি। সম্পাদক ধৈর্য ধরে সব কথাই শোনেন, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যায় আমার কোনো কথাই তিনি বিশ্বাস করেন না। কারণ তিনি আমায় আজ পনরো বছর ধরে চেনেন। লেখবার মেয়াদ আর কয়দিন বাড়িয়ে দিয়ে আবার বিশেষ একটা তারিখ আমার ক্যালেণ্ডারে দাগ দিয়ে রেখে তিনি গম্ভীরমুখে আসামীর বিচার-মুলতুবি-রাখা বিচারকের মতো বিদায় নেন। ধরা পড়া অপরাধীর মতো অপ্রস্তুত হয়ে বিরস মুখে আমি বসে থাকি।

না, কুড়েমির দুঃখ ও শাস্তি যে অনেক সে কথা অস্বীকার করবার সাধ্য আমার নেই। তবু কুড়েমি ত্যাগ করা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না, কারণ ত্যাগ করতে আমি চাইও না। আমার নিজের কুড়েমি হয়তো মাত্রাছাড়া কিন্তু তাবলে কুড়েমির ওকালতি করবারও যথেষ্ট আছে। কুড়েমিই যদি না করলাম তাহলে মানুষ হবার দুর্লভ গৌরব কিসে? কাজ তো সবাই করে, সূর্য, চন্দ্র, তারা, জড় থেকে চেতন সমস্ত সৃষ্টি কাজের অমোঘ শৃঙ্খলে বাঁধা। কুড়েমি করবার ঐশ্বরিক অধিকার শুধু একমাত্র মানুষের। তার মনুষ্যত্বের চরম প্রকাশ এই কুড়েমি করবার স্বাধীনতায়।

অন্য প্রাণী বিশ্রাম করে মাত্র, মানুষই শুধু ইচ্ছে করলে কাজে ফাঁকি দিয়ে কুড়েমি করতে পারে। ঘরে বসে যখন তার সারাদিনের হিসেব লেখা দরকার, ছাদে শুয়ে তখন তারা গুণতে পারে, ওপারের হাটে যখন বেচাকেনা করতে না

গেলে নয়, তখন আনমনে নদীর স্রোতে ভেসে যেতে পারে চেনা ঘাট ছাড়িয়ে নিরুদ্দেশে।

কাজের গণ্ডি দেওয়া জীবন থেকে কুড়েমির অলস স্রোতে ভেসেই মানুষ একদিন শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের রহস্যলোকের সন্ধান পেয়েছে, মাটি থেকে অকারণে ওপরে চোখ তুলে দেখতে পেয়েছে আকাশ।

কাজের টানাপোড়েনে জীবন যত খাপি করেই বোনা হোক না কেন, কাজে কুড়েমির ফাঁক না রাখলে, বেঁচে থাকার আসল মানেটাই যায় হারিয়ে। সভ্যতার শুরু থেকে কাজের সুসার আর সময় সংক্ষেপ করবার আপ্রাণ চেষ্টা তো করে আসছি। সভ্যতাটা আসলে সেই সাধনারই ইতিহাস, দু'হাতে দশহাতের কাজ সারবার আগ্রহে এখন আমরা এক আঙুলের টিপুনিতে, দশ, বিশ লক্ষ তুরঙ্গ-বিক্রম ইচ্ছামতো পরিচালনা করার ক্ষমতা লাভ করেছি, দু'বছরের পথ দু'দিনের জায়গায় দু'দণ্ডে পার হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এত সুসার এত সংক্ষেপ সেকি শুধু আরো কাজ বাড়াবার জন্যে। শুধু কাজ আর কাজ, জীবনে কি তার বাইরে আর কিছু নেই। কাজ করবার নেশায় কাজের উদ্দেশ্যই যাবো ছাড়িয়ে? এঞ্জিন চালাবার উৎসাহে স্টেশনের কথা আর খেয়াল থাকবে না?

দুনিয়ার মানুষকে কাজের ভূতে আজ এমন পেয়ে বসেছে যে, কাজ না থাকলে অকাজের খই ভাজতেও তার আপত্তি নেই। দরকারের বেশি কাজের নেশাতেই এত মারামারি,

কাটাকাটি, আখ্‌ছা আখ্‌ছি। এর চেয়ে পৃথিবীর মানুষ যদি আর এতটু বেশি কুড়ে হতো, নির্বিরোধ কুড়েমির উদার দীক্ষা যদি তারা পেতো তাহলে দুনিয়ার অনেক সমস্যার সমাধানের ভাবনা থাকতো না, কারণ সমস্যা-সৃষ্টির সুযোগই থাকতো অল্প।

কুড়ে হলে আজকের দিনের ব্যস্তবাগীশ জাতগুলো কাজের ধান্দায় পথে বিপথে ছুটোছুটি ধাক্কাধাক্কি না করে হয় তো দু'দণ্ড নিজেদের চৌকাঠে বসে পাড়াপড়শির সঙ্গে আলাপ করতো, চিনতো, বুঝতো ভালোবাসতো পরস্পরকে। কুড়ে লোক ফাঁকা মাঠ দেখলে দাঁড়ায়, খানিক বাদে শুয়ে পড়ে, কিন্তু কাজের লোক মাঠ দেখলে আগেই যায় মাপতে তারপর দখল করবার জন্যে লাঠালাঠি বা মামলা না বাধিয়ে তার সোয়াস্তি নেই। ফাঁকা মাঠ দেখে শুয়ে পড়বার লোক যদি পৃথিবীতে বেশি থাকতো, তাহলে মাঠ খুঁড়ে পরিখা কাটার প্রয়োজন অন্তত হতো না।

কাজ নিয়ে এই ক্ষ্যাপামি রোগের বীজ ঠাণ্ডা দেশগুলো থেকেই আমদানি। আমাদের গরম হাওয়ায় ও-রোগ আপনা থেকে গজায় না, আমদানি হলেও তেমন চেপে ধরে ছড়াতে পারে না। ঠাণ্ডা দেশের অভাগা মানুষদের রক্ত গরম রাখবার তাগিদেই লাফালাফি দাপাদাপিটা বেশি করতে হয়। তাদের নকল করে সাধ করে ও-রোগের বীজ রক্তে ঢুকিয়ে ক্ষেপে ওঠার মতো আহাম্মুক আমরা হতে যাই কেন? ঠাণ্ডা দেশেরও এখন এ রোগ সারাবার সময় হয়েছে,

কাজের নেশা অকাজের সর্বনাশে পৌঁছোতে নইলে আর দেরি হবে না।

সভ্য হওয়া অবধি কাজ তো অনেক করলাম, এবার মানুষ জাতটার একটু কুড়েমি করবার ফুরসত কি হয়নি— ফাঁকা মাঠে গিয়ে একটু বসবার, দিগন্তের একটি তারা কি ঘাসের ডগার শিশির কণাটিকে দেখবার ? কুড়েমি মানে তো মনের শূন্যতা নয় অসীম রহস্যে ডগমগ মনের নিথর নিটোল পূর্ণতা।

একটি স্বাক্ষর

বর্তমান ইংরাজী সাহিত্যের পৃষ্ঠায় দুটি স্বাক্ষর বুঝি সবচেয়ে গভীর ও সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। নামের আদ্যাক্ষর দেওয়া এই দুইটি স্বাক্ষর চেনে না, এমন ইংরাজী সাহিত্য-রসিক জগতে নেই। স্বাক্ষর দুটি জি-বি-এস্ ও জি-কে-সি।

জি-বি-এস্ ও জি-কে-সি শুধু সাহিত্যিকের পরিচয় বহন করে না, বর্তমান যুগের ইংরাজী ভাষার জগতে এই ছয়টি আদ্যাক্ষর সবচেয়ে বিশিষ্ট ও বেগবান চিন্তাধারার প্রতীক।

জি-বি-এস্ ও জি-কে-সি বলতে যে জর্জ বার্নার্ড শ' ও গিলবার্ট কীথ চেস্টারটন বোঝায়, একথা ভেঙে বলবার নিশ্চয় প্রয়োজন নেই। এই দুই সাহিত্যরথীর নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করবারও হেতু আছে। এই দুই সাহিত্যিকের মিল ও গরমিলগুলি সত্যিই পাঠক সাধারণের পরম কৌতূহলের বিষয়। এঁদের মধ্যে বার্নার্ড শ' ছিলেন বয়সে বড়, রোগা চেঙ্গা তাঁর চেহারা, গায়ের চামড়ার রঙ ও মসৃণতা শেষ বয়সেও কিশোরীদের হার মানায়। নিরামিষ ছাড়া তিনি কিছু খেতেন না, অত্যন্ত সংযত ও নিয়মবদ্ধ ছিল তাঁর জীবন যাপন প্রণালী; কোনোরকম নেশা তাঁর ছিল না।

গিলবার্ট কীথ চেস্টারটন চেহারায় আর চাল-চলনে

একেবারে উল্টো ছিল বললেই হয়; তাঁর স্থূলতা একটা পরিহাসের ব্যাপার, নিজেই তিনি সে বিষয় নিয়ে রসিকতা করতে ছাড়েন নি। নিরামিষ শুধু যে তিনি খেতেন না তা নয়, নিরামিষাশীদের তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না।

কিন্তু সমস্ত বাহ্যিক গরমিলের তলায় দুজনের কোথায় যেন আশ্চর্য মিল ছিল। সে মিল বুঝি তাঁদের মনের গড়নে। ভিক্টোরিয়ান যুগের ফাঁকা আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রাধারণ করে দুজনেই সাহিত্যের আসরে নেমেছিলেন। আধুনিক যুগের ফাঁকা আত্মম্ভরিতা ও বিজ্ঞানের মদমত্ততার বিরুদ্ধে দুজনেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চিরদিন যুঝে এসেছিলেন। তাঁদের বাঁকা বিদ্রূপের ভঙ্গিও বুঝি অনেকটা একরকম।

কিন্তু, এ মিল বেশীদূর খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে। গিলবার্ট কীথ চেস্টারটন ও বার্নার্ড শ'-এর চিন্তাধারা বিভিন্ন দিক থেকে এক মোহানায় এসে একবার মিলেই আবার তফাৎ হয়ে গিয়েছে। চেস্টারটনের আদর্শ থেকে শ'-এর আদর্শের মধ্যে শেষ পর্যন্ত দুই মেরুর পার্থক্য।

দুজনের মধ্যে চেস্টারটনের সাহিত্যিক চরিত্রই সত্যকথা বলতে গেলে বেশী বর্ণাঢ্য। লেখনীর ধার হয় তো দুজনেরই সমান কিন্তু চেস্টারটনের উদ্দাম উল্লাস শ'-এর মধ্যে নেই। শ' সুনিপুণ এবং সংযত; চেস্টারটন প্রাণের প্রাচুর্যে, নিছক আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছৃঙ্খল। বার্নার্ড শ'কে যদি ভাষার ওস্তাদ খেলোয়াড় বলা যায়, চেস্টারটন তাহলে সত্যকার

গুণী ভাঁড়, সমস্ত উন্মত্ত আস্ফালনের মধ্যে যার পায়ের টাল ঠিক থাকে।

চেস্টারটনের রচনার এই বিশিষ্ট ভঙ্গীই তাঁকে প্রথম থেকেই সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত করে দেয়। খুব বেশীদূর না গিয়ে এই বাঁকাবুলির ভঙ্গীকে আমরা অস্কার ওয়াইল্ড (Oscar wilde) পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারি। এপিগ্রামের তিনি ছিলেন রাজা, কথার ভেল্কিবাজি সচেতনভাবে তিনিই একরকম প্রথম শুরু করেন। কিন্তু, কথা পেঁচিয়ে বলবার সুযোগ পেলে ওয়াইল্ড বক্তব্যের সঙ্গতির অনেক সময়ে ধার ধারতেন না। বাঁকা কথা বলার সুখেই তিনি ভাষার কারিকুরি করতেন, অর্থ তার যেদিকেই যাক না কেন।

ওয়াইল্ডের এই পদ্ধতি যে দুটি লোক তাঁর পরে সাহিত্যে সুনিপুণভাবে প্রয়োগ করলেন, তাঁরা দুজনেই চরিত্রে, প্রকৃতিতে ও আদর্শে একেবারে ওয়াইল্ড থেকে আলাদা।

বার্নার্ড শ'কেও প্রথমে লোকে সুরসিক মজাদার ভাঁড় হিসেবেই গ্রহণ করেছে। তাঁর কথার মারপ্যাঁচে যারা আমোদ পেয়েছে, তাঁর বক্তব্যের মর্যাদা তারা দিতে চায়নি। তাঁর প্রচ্ছন্ন সুতীক্ষ্ণ খোঁচা খেয়েও ভিক্টোরিয়ান যুগের চেতনা হয়নি যে, ভাষার কারদানির আড়ালে এই অসামান্য লোকটির প্রকাশ করবার মতো কোনো বাণী আছে। প্রচারক বার্নার্ড শ'কে ভাঁড়ামির ভিতর দিয়ে সেদিন সুস্পষ্টভাবে খুঁজে বার করবার প্রতিভা কারুর ছিল না।

মজার কথা এই যে, তাঁরই মতো আর এক ভাষার

বাজীকর প্রথম বার্নার্ড শ'র সত্যকার স্বরূপ সমস্ত ভাঁড়ামির অন্তরাল থেকে প্রকাশ করে দেখান। ১৯০৫ সালে চেস্টারটনের 'হেরেটিক্স' (Heretics) নামে প্রবন্ধের বই বেরোয়। যে যুগের যে সমস্ত মানী ও গুণী লোকদের সম্বন্ধে সে বই-এ আলোচনা আছে, তার মধ্যে বার্নার্ড শ' অন্যতম। তারপর গত একত্রিশ বৎসরে শ'-এর প্রতিভা ও দুর্বলতার এমন নিখুঁত যাচাই আর হয়নি বলা যায়। শ' ও চেস্টারটনের মনের গড়নের গভীর মিল ও গরমিল সেই প্রবন্ধতেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ। জীবন সম্বন্ধে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গীর সত্যকার পরিচয় সেখানে পাওয়া যায়।

আগেই বলেছি বার্নার্ড শ'-এর চেয়ে চেস্টারটন অনেক বেশী উদ্দাম। তাঁর রচনা উন্মত্তভাবে বাঁকা কুটিল রেখার সমারোহ সৃষ্টি করে চলে। কিন্তু, সমস্ত উচ্ছল তরঙ্গ-ভঙ্গের তলায় তাঁর সত্যোপলব্ধির জগৎ স্থির। তাঁর বাহ্যিক মত্ততা ভিতরকার মতের অটলতারই পরিচয় দেয়। খুঁটি ঠিক রেখেই তিনি তার চারিধারে ক্ষ্যাপামি করে ফেরেন।

চেস্টারটন এক হিসাবে একেবারে গোঁড়া, জীবনের চিরন্তন সত্য ও সৌন্দর্যে গভীর তাঁর আস্থা ও অনুরাগ। আধুনিক বিশৃঙ্খলার যুগে চিন্তার বর্তমান নৈরাজ্যে জীবনের এই চিরন্তন সত্য ও সৌন্দর্য্যের বিপন্ন ভিত্তি-মূল সমস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে আগলাবার ভার তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। সে ভার একাকী বহন করবার সত্যই তিনি উপযুক্ত। তথাকথিত গোঁড়ামির এত বড় গুণী এমন অপরূপ প্রচারক

ও প্রহরী আর কখনও বুঝি দেখা যায়নি। জীবনের সমস্তক্ষেত্রে যারা বিপ্লব আনতে চায়, তাদের উদ্দামতাও এই গোঁড়া সনাতনীর তুলনায় শান্ত। তাঁর যুদ্ধের ছলাকলার অন্ত নেই। বিপক্ষের অকাট্যতম যুক্তি তাঁর অপরূপ লেখনী-কৌশলে তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই ফিরে গিয়ে তাদের হাস্যাস্পদ করে তোলে।

বিপক্ষকে হাস্যাস্পদ করে তুললেও চেস্টারটনের বিদ্রূপে কিন্তু নিষ্ঠুরতা নেই। হাস্যাস্পদকেও নিজের সঙ্গে হাসাবার অদ্ভুত বিদ্যা তাঁর আয়ত্ত। হেসে ও হাসিয়েই তিনি সারা জীবন দিগ্বিজয় করে ফিরেছেন।

চেস্টারটনের আগে ইংরাজী সাহিত্যে এমন প্রাণখোলা হাসি কখনও শোনা গিয়েছে কিনা সন্দেহ। প্রাণের এমন প্রাচুর্য নিশ্চয় নয়। জীবনে অনেক অসম্ভব অভিযানে তিনি যাত্রা করেছেন। হতাশ হয়ে যেখানে সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে, সেখানেও কোনোদিন তাঁর মুখের হাসি মিলায় নি, তাঁর উৎসাহে ভাঁটা পড়ে নি। Cervantes-এর অমর বীর Don Quixote-এর মতো অসাধ্যসাধনে তাঁর সবচেয়ে বেশী উৎসাহ। বুয়র-যুদ্ধের সময় তিনি ন্যায়ধর্মের খাতিরে বুয়রদের হয়ে কলম চালিয়েছেন। কিপ্লিং প্রমুখ সাম্রাজ্যবাদীর শিশুসুলভ দম্ভকে তিনি বিদ্রূপ-বাণে নাকাল করে তুলেছেন, মেয়েদের সাফ্রেজিস্ট আন্দোলনের মাতামাতি থেকে বাতিকগ্রস্ত নিরামিষাশীদের হুজুক পর্যন্ত কিছুই তাঁর কাছে নিস্তার পান নি। Sanity-কে যদি কাণ্ডজ্ঞান বলে

বোঝানো যায়, তাহলে আধুনিক যুগের বিকৃত যান্ত্রিক আধ-পাগলামির জগতে এই কাণ্ডজ্ঞানের ধারা সর্বত্র অমলিন রাখাই ছিল তার ব্রত। এ যুগের অনেক রাশভারী মিথ্যার মুখোস তাঁর কলমের আঘাতে খসে গিয়েছে, অনেক হোমরাচোমরা মতবাদের ফাঁপানো ফানুস তাঁর বিদ্রূপ-বাণে ফেঁসে গিয়েছে। বার্নার্ড শ', এচ. জি. ওয়েলেস, ডীন ইঞ্জ থেকে ছোট বড় কোনো রথী-মহারথীই তাঁর হাতে অক্ষত থাকে নি।

রস-সাহিত্য-সৃষ্টির অসামান্য প্রতিভা তাঁর যে ছিল, তাঁর কবিতাগুলিই তার প্রমাণ। কিন্তু, সে প্রতিভা নিয়ে নিভৃত বিশ্রাম তিনি খোঁজেন নি। হাটের মাঝে মানুষের চলাচলের পথে দাঁড়িয়ে মিথ্যা, অন্যায় ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সারাজীবন তিনি লড়াই করে গিয়েছেন।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে তিনি পরম ক্ষত্রিয়, —শুধু সাজ তাঁর বিদূষকের।

চেস্টারটনের সাহিত্যিক প্রতিভা অত্যন্ত অল্প বয়সেই প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৭৪ সালের ২৯শে মে তারিখে লণ্ডনে তাঁর জন্ম হয়। সেণ্ট পলস স্কুলে পড়াশুনা করতে গিয়ে সেখানেই কবিতা লিখে তিনি মিল্টন পুরস্কার লাভ করেন। এত অল্প বয়সে এ পুরস্কার ইতিপূর্বে আর কেউ পায় নি। ১৮৯৪ সালে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে কিন্তু তিনি সাহিত্যের বদলে প্রথমে চিত্রের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। ছবির হাত তাঁর ভালোই ছিল, কলমের সঙ্গে তুলিও তিনি

মাঝে মাঝে চালিয়ে এসেছেন। কিন্তু, চিত্রে একনিষ্ঠ হবার অভিপ্রায় কিছুদিন পরেই তিনি পরিত্যাগ করেন। সাহিত্যই তারপরে তাঁর সুয়োরানী হয়ে ওঠে।

বিলাতে অধিকাংশ লেখকের সাহিত্য-জীবন যে ভাবে আরম্ভ হয়, চেস্টারটনের বেলায় তার ব্যতিক্রম হয় নি। কাগজপত্রে বই-এর সমালোচনা ও ছুটো-ছাটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেই তিনি প্রথম এ জীবনে প্রবেশ করেন। প্রকাশকের আপিসে বই-এর পাণ্ডুলিপি বিচার করেও এই সময়ে তাঁকে দিন চালাতে হয়েছে।

কিন্তু, কিছু দিনের মধ্যেই তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইংরাজী ভাষায় নতুন এক গুণীর অপূর্ব কলম যে চলতে শুরু হয়েছে, এ খবর আর গোপন থাকে না। ছাব্বিশ বছর বয়সে এই সমস্ত কাজ করতে করতেই তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই বার করেন। বই-এর নামে চেস্টারটন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে বুঝি নিজেরই পরিচয় দিয়েছিলেন।

'দি ওয়াইল্ড নাইট' (The wild knight) বেরুবার পরই সমালোচকদের বিশেষ প্রশংসা তিনি লাভ করেন। ওয়াইল্ড নাইটের ভাবী দিগ্বিজয় সম্বন্ধেও অনেকে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ বাণী করেন।

তার পরের বৎসরই চেস্টারটনের বিবাহ হয় মিস ফ্রান্সেস ব্লগ নামে একটি মেয়ের সঙ্গে। চেস্টারটনের বিবাহিত জীবন তাঁর সাহিত্যের নেপথ্যেই চিরদিন থেকে গিয়েছে, কিন্তু

তবু আভাসে ইঙ্গিতে মনে হয়, সে জীবনে তিনি সত্যিই সুখী ছিলেন। বিবাহের বৎসরেই চেস্টারটনের খবরের কাগজে দেওয়া প্রবন্ধগুলি একসঙ্গে প্রথম বই-এর আকারে বার হয়। নাম দেওয়া হয় 'দি ডিফেণ্ড্যাণ্ট' (The defendant)। চেস্টারটন তখনই সাহিত্যের ক্ষাত্রধর্মে দীক্ষা নিয়েছেন। ভিক্টোরিয়ান যুগের তখন সায়াহ্ন, কিন্তু সেই গোধূলি বেলাতেই তার অন্ধ আত্মাভিমান ও সঙ্কীর্ণতা সব চেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। তারই বিরুদ্ধে, মানুষের জীবনের গভীর সত্য ও সৌন্দর্যের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে চেস্টারটন সেদিন অস্ত্রধারণ করেছিলেন। ভিক্টোরিয়ান যুগ শেষ হয়ে গেলেও সে অস্ত্র আর নামাবার অবসর চেস্টারটনের হয় নি। ভিক্টোরিয়ান যুগের সঙ্কীর্ণ আত্মপ্রসাদের জায়গায় আধুনিক যুগের উন্নাসিক অহমিকা ও বিজ্ঞানের কাঁচা ভিত্তিতে সর্বজ্ঞতার দুর্বল ও হাস্যকর অভিমান তারপর তাঁকে সংগ্রামে নিযুক্ত রেখেছে। এই সময়ে 'স্পীকার' (Speaker) ও 'ডেলী নিউজ' (Daily News) কাগজে তিনি নিয়মিত ভাবে লেখা দেবার জন্য আহূত হন। তারপর সারাজীবনে বহু কাগজের সংস্রবে তিনি এসেছেন। শেষ দিকে 'ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ' (Illustrated London News)-এর প্রথম পৃষ্ঠা নিয়মিত ভাবে তাঁর লেখায় অলঙ্কৃত হয়েছে। 'জি-কে-সি-র উইকলি' (G. K. C's weekly) বলে একটি কাগজ নিজের ব্যয়েও তিনি চালিয়েছেন। অন্যান্য নানা সাময়িক কাগজেও তাঁর লেখা বার হয়েছে।

সংবাদপত্র বা সাপ্তাহিক কাগজের সাময়িক লেখার মূল্য সাধারণতঃ সে কাগজ ছাপিয়ে ওঠে না, তার পরমায়ুও সেই কাগজের সঙ্গেই শেষ হয়। কিন্তু, চেস্টারটনের অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে লেখা নিতান্ত সাময়িক রচনাও অমরত্ব না হোক সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করেছে। তাঁর সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলিই বই-এর আকারে পাঠক-সাধারণ সাগ্রহে গ্রহণ করেছে। ১৯০১ সালে 'ডিফেণ্ডাণ্ট' (The defendant) প্রকাশিত হবার পর থেকে 'টুয়েল্ভ টাইপ্স' (Twelve Types) 'ট্রিমেণ্ডাস ট্রাইফলস্' (Tremendous-Trifles) 'অল থিংস কন্সিডার্ড' (All Things Considered) 'মিসেলেনী অব মেন' (Miscellany of men) 'দি ইউজেস অব ডাইভারসিটি' (The uses of Diversity) 'অ্যালার্মস এণ্ড ডিস্কার্সান্স' (Alarms and Discursions) 'হেরেটিক্স' (Heretics) প্রভৃতি বহু এই ধরনের প্রবন্ধের বই এ পর্যন্ত বার হয়েছে। তাদের কোনোটিই অবহেলা করবার মতো নয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দশকে তাঁর প্রতিভার আরও বহু দিকে বিকাশ আমরা দেখতে পাই। সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে তিনি ১৯০৩ খৃস্টাব্দেই উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছেন। সেই বছর 'ইংলিশমেন অব লেটার্স সিরিজ' (Englishmen of Letters Series)-এ তাঁর রবার্ট ব্রাউনিং সম্বন্ধে সমালোচনার বই বের হয়। রবার্ট ব্রাউনিং-এর সমালোচনায় যে সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তি, যে গভীর

রসবোধ, যে অসাধারণ দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়, তার পরিপূর্ণ বিকাশ দেখি, ওই সিরিজেই প্রকাশিত তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'Charles Dickens'-এ। ইংরাজী ভাষার একটি শ্রেষ্ঠ সমালোচনার বই বলে এটি গণ্য।

এই সময়ে উপন্যাসেও তিনি হাত দেন। সে উপন্যাসের রূপ অবশ্য সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব। উপন্যাস না বলে রূপক বললেই তার অনেকটা বর্ণনা হয়। ১৯০৪ সালে 'নেপোলিয়ন অব নটিং হিল' (Napoleon of Notting Hill) প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের নায়ক চেস্টারটন নিজে না হলেও তাঁরই মন্ত্র-শিষ্য। মোহমুক্ত বিজ্ঞানোন্মত্ত নয়, পৃথিবীকে রঙিন বিস্ময়ের চোখে যে দেখে, সেই সন্ধান পায় পরম সত্যের—চেস্টারটনের নায়ক এই কথাই প্রমাণ করতে অপরূপ আষাঢ়ে এক কাহিনীতে নেমেছেন। লণ্ডন সহরের দুই সহরতলীকে নিয়ে আধুনিক কালের পশ্চাৎপটে কল্পিত বলেই গল্পটি আরও অপরূপ হয়ে উঠেছে।

১৯০৫ সালে তাঁর আর একটি অন্য ধরনের উপন্যাস বেরোয়। এই বইটির ভিতরেই তাঁর ভবিষ্যৎ ডিটেকটিভ কাহিনীগুলির বীজ সঙ্গোপন ছিল বলা যেতে পারে। 'দি ক্লাব অব কুইয়ার ট্রেডস' (The Club of Queer Trades)-এ যে ক্ষমতার আভাস দেখা যায় 'ফাদার ব্রাউন' (Father Brown)-এর নামে পরবর্তী ডিটেকটিভ গল্পে তারই পরিণতি। 'দি ম্যান হু ওয়াজ থার্সডে' (The man who was Thursday) 'দি বল এণ্ড দি ক্রস্' (The ball and

the cross) প্রভৃতি বইও এই সময়ে লেখা। উপন্যাস ও ডিটেকটিভ গল্পকে মনোহর করে তোলবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে অদ্ভুত কৌশলে তাঁর মতবাদের বাহনও তিনি করেছেন। জটিল অপরাধের সূত্র আবিষ্কার করার উত্তেজনাতেও তাঁর মতবাদের খেই তিনি হারিয়ে ফেলেন নি। উপাদেয় গল্পগুলির সঙ্গে তাঁর জীবন-দর্শন অদ্ভুতভাবে মিশে আছে।

রাজনীতি ও ধর্ম সম্বন্ধেও তিনি গভীর ভাবে এই দশ বছর আলোচনা করেছেন, দেখা যায়। 'অর্থডক্সি' (Orthodoxy) ও 'হোয়াট্‌স্ রং উইথ দি ওয়ার্ল্ড' (What's wrong with the world) এই সময়কার নাম-করা বই।

১৯১১ সালে তাঁর কাব্য-প্রতিভা 'লেপাণ্টো' (Lepanto)-তে সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছে, মনে হয়। আলঙ্কারিক কাব্যের এমন নিদর্শন সত্যই বিরল। ১৯১১ সালেই 'এ সঙ অব দি হুইলস্' (A song of the wheels) তিনি লেখেন। তারপর ১৯১৫ সালে 'দি ব্যালাড্ অব দি হোয়াইট হর্স' (The Ballad of the white Horse) বার হয়। তার আগে ১৯১৩ সালে তাঁর প্রথম তিন অঙ্কের নাটক 'ম্যাজিক' (Magic) অভিনীত হয়েছে। নাটক হিসাবে 'ম্যাজিক' যথেষ্ট সমাদর দর্শক ও সমালোচকদের কাছে লাভ করেছিল, কিন্তু তবু বহুদিন তিনি নাটকে আর হাত দেননি।

'ফাদার ব্রাউন' (Father Brown) সিরিজের

ডিটেকটিভ গল্পগুলি ১৯১১তে তিনি লিখতে শুরু করেন। কনান ডয়েলের সার্লক হোমসের পর এমন অপরূপ মধুর চরিত্র গোয়েন্দা হিসাবে এ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে নি, এ কথা অনায়াসে বলা যায়। চেস্টারটনের রচনাভঙ্গির গুণে এই ডিটেকটিভ গল্পগুলি শুধু রহস্য-ক্ষুধা মেটায় না, তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু করে। তার মধ্যে উপাদেয় সাহিত্যের স্বাদ আছে।

'ম্যান অ্যালাইভ' (Man Alive) ও 'দি ফ্লাইং ইন' (The flying Inn) নামে আর তুটি সামাজিক-রাজনৈতিক রূপক এবং 'ভিক্টোরিয়ান এজ্ ইন লিটারেচার' (Victorian Age in Literature) নামে একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনার বই এই সময়কার উল্লেখযোগ্য রচনা।

১৯২২ সালে তাঁর জীবনে একটি বিপুল পরিবর্তন আসে। পরিবর্তন না বলে তাকে পরিণতি বলাই উচিত। তাঁর মনের স্বাভাবিক গতি ও প্রকৃতিই তাঁকে জীবনের পথের এই বাঁকে নিয়ে এসেছে। ১৯২২ সালে তিনি ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রটেস্টাণ্ট ধর্মের ঋজু কাঠিন্য তাঁর বর্ণাঢ্য উদ্দাম প্রকৃতির উপযোগী নয়, এ কথা অবশ্য বহুদিন আগেই চেষ্টা করলে অনুমান করা যেতো। ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের ফলে তাঁর যে কিছু রূপান্তর হয়, এমন নয়। তাঁর জীবন ও রচনাকে ক্যাথলিক হবার আগে ও পরে তুটি আলাদা ভাগে ভাগ করা যায় না। পূর্বের ধারা অব্যাহতভাবেই নূতন খাতে প্রবেশ করে। 'সেণ্ট ফ্র্যান্সিস অব অ্যাসিসি' (St.

Francies of Assisi) তাঁর ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণের পরে লেখা, কিন্তু তার আগেও এ বই তিনি অনায়াসে লিখতে পারতেন।

১৯২২-এর পরেও তিনি অজস্রভাবে লিখে গিয়েছেন। আধুনিক যুগের এমন কোনো সমস্যা, এমন কোনো ঘটনা নেই, যা তাঁর দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। ইহুদিদের জেরুসালেমে নতুন উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা, সমাজতন্ত্রবাদ, বিবর্তনবাদ—সব কিছু নিয়ে শুধু যে তিনি মাথা ঘামিয়েছেন তা নয়, সমস্ত সমস্যার উপর অনন্যসাধারণ প্রতিভার আলোকপাতও করেছেন। ইহুদি-সমস্যা সম্বন্ধে 'দি নিউ জেরুসালেম' (The New Jerusalem) বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে 'দি এভারলাস্টিং ম্যান' (The Everlasting Man) প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হবে না নিশ্চয়, সে ভাবে বইগুলি লেখাও হয়নি, কিন্তু সমস্ত বিষয়কে অপ্রত্যাশিত নতুন কোণ থেকে দেখবার যে গুণপণা, ভিত্তিহীন সংস্কার ও মতের ভড়ং ভেঙে দেবার যে কৃতিত্ব, সমাধানের নূতন পথের ইঙ্গিত দেবার যে কৌশল তার ভিতরে পাই, তারই জন্যে বইগুলি অমূল্য বলা চলে।

এত অজস্রভাবে লিখেও তিনি যে কোনোদিন ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি, এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। রচনার অস্বাভাবিক অসাধারণ জৌলুশ শেষ পর্যন্ত তিনি বজায় রেখেছেন। বিস্ময়কর দীপ্তি অনেকের রচনায় দেখা দেয়, কিন্তু তার এমন সুদীর্ঘ পরমায়ু কখনও নয়। প্রদীপের মতো

অনেকে দীর্ঘকাল ধরে জ্বলে, কিন্তু তুবড়িবাজির মতো এতদিন ধরে জ্যোতির এমন উন্মত্ত উৎসব চালিয়ে যাওয়ার দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণ করা যায় না।

চেস্টারটনের জীবন-দর্শন এবং অধিকাংশ মত একরকম অপরিবর্তিত থাকলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনেক ঘাটে ভিড়েছেন। গোঁড়া লিবারেল হিসাবে তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে নেমেছিলেন, কিন্তু কিছুদিন বাদেই আধুনিক দলাদলির রাজনীতিতে তাঁর অশ্রদ্ধা জন্মে যায়। যন্ত্র-যুগের পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রও তাঁকে হতাশ ও বিদ্বিষ্ট করে তোলে। তবে বার্নার্ড শ'-এর মতো সমাজতন্ত্রবাদের সংশোধিত কোনো পরিকল্পনাতে তিনি সান্ত্বনা খোঁজেননি, আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অবিচার থেকে তিনি সম্পূর্ণ নূতন পথে মুক্তি সন্ধান করেছেন। তাঁর অর্থনৈতিক মতবাদকে 'ডিস্ট্রিবিউটিজম' (Distributism) বা বিতরণ-বাদ বলা হয়। এই বিতরণ-বাদের প্রচারে তাঁর আজীবনের বন্ধু ইংরাজী ভাষার আর এক শক্তিমান সাহিত্যিক 'হিলেয়ার বেলক' (Hillaire Belloc) তাঁর সহায় ছিলেন। 'ডিস্ট্রিবিউটিজম' (Distributism) কে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে এই দুই শক্তিমান বন্ধু মিলেও পারেন নি। এই মতবাদের প্রসারও তেমন হয় নি, কিন্তু তার প্রভাব চিন্তার জগতে একবারে পড়েনি মনে করলে ভুল হবে।

হিলেয়ার বেলকের সঙ্গে চেস্টারটনের বন্ধুত্ব সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবার যোগ্য। সম্পদে বিপদে

সুদিনে দুর্দিনে, এই দুই বন্ধু যে ভাবে পরস্পরের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তার তুলনা বড় একটা মেলে না। হিলেয়ার বেলকের ফরাসী রক্তে জন্ম। চেস্টারটনের গভীর, এমন কি অন্ধ ফরাসী প্রীতির মূলে এই বন্ধুত্ব যে অনেকখানি কাজ করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যে রচনাভঙ্গির বিশেষত্বের জন্যে চেস্টারটন ইংরাজী সাহিত্যে অতুলনীয় স্থান অধিকার করে আছেন, দু'-এক কথায় তার পরিচয় দিতে গেলে ভুল ধারণা গড়ে উঠবার সম্ভাবনাই বেশি। চেস্টারটনের ভাষায় বাঁকা বিন্যাস প্রথমেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একেবারে আজগুবি উল্টো কথার ভিতর দিয়ে সহজ সত্যকে প্রকাশ করবার বাহাদুরির জন্য তাঁকে 'প্যারাডক্স'-এর রাজা বলা হয়। তিনি যখন বলেন,—

'বাঁধা মত না হলে মুক্তি মেলে না। মানুষ বিচিত্র, বিচিত্র হওয়াই উচিত, কিন্তু এই বৈচিত্র্যের ভিতর আনন্দ পেতে গেলে সংযোগের একটি নির্দিষ্ট পথ থাকা দরকার।'

'এ যুগের মূল কথা হলো সিদ্ধকল্পের ব্যর্থতা। আমরা খেলার নিয়ম এমন করে গড়েছি যে, যে জেতে, সে হয় সব কাজের বার। পুরস্কার ছাড়া আর কিছু পাবার যোগ্যতা তাদের থাকে না।'

তখন মতে না মিললেও কথার প্যাঁচে কান খাড়া হয়ে উঠতে বাধ্য। চেস্টারটন এই কৌশলে কান ধরে তাঁর সমসাময়িকদের অনেক অপ্রিয় সত্য শুনিয়েছেন বলা যেতে

পারে। কিন্তু এইরকম 'প্যারাডক্স' এবং শব্দ নিয়ে হাতসাফাই থেকে তাঁর সমৃদ্ধ রচনাভঙ্গির পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না।

"There is a shrewd warning to be given to all people in revolt. And in the present state of things all men are revolting in that sense except a few who are revolting in the other sense."

তাঁর বই-এর পাতায় এরকম কথা অজস্রভাবে ছড়ানো কিন্তু এগুলিকে বাহ্যিক ঝুটা কাজ বলাই উচিত। তাঁর রচনার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য ভিতরের অবর্ণনীয় উদ্দাম উল্লাসে, অপ্রত্যাশিত বিস্ময়কর বিন্যাসে। ভাষার চড়াই উৎরাই-এ গলদঘর্ম হয়ে অন্যে যে সত্যের নাগাল পায় না, সামান্য একটু হাস্য-সরস কথার প্যাঁচে তিনি তাকে সরল ও সুস্পষ্ট করে তোলেন। 'Should shop assistants marry ?' প্রশ্নের উত্তরে উত্তেজিত হয়ে তিনি যখন জিজ্ঞাসা করে বসেন 'Should hats have heads in them ?' অথবা 'Should a tail be ornamented with a dog before it ?' তখন এই অপূর্ব উন্মত্ত প্রশ্নের মধ্যে তাঁর রচনারীতি ও অসামান্য কাণ্ডজ্ঞানের কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বোধ হয়। শুধু কথার প্যাঁচই তাঁর সম্বল নয়, ভাষা তাঁর বিচিত্র বর্ণাঢ্যতায় অতুলনীয়। কোনোরকম না খুঁজে-পেতে একটি জায়গা তুলে দিচ্ছি—

' 'গথিক'-এর সত্য পরিচয় হলো এই যে প্রথমতঃ তা অত্যন্ত জীবন্ত, দ্বিতীয়ত তা অগ্রগামী। 'গথিক' হলো ধর্মের যোদ্ধৃরূপ। গথিকই একমাত্র রণমত্ত স্থাপত্য। চূড়া নয়, উদ্যত সব বর্শা আছে থেমে, সব পাথর যেন ক্ষেপণ যন্ত্রে আছে ঘুমিয়ে। এক মুহূর্তের দৃষ্টি-বিভ্রমে মনে হলো, যেন খিলানগুলি তরবারির মতো পরস্পরের বিরুদ্ধে উঠেছে ঝলসে, শুনতে পেলাম তাদের ঝঞ্ঝনা। অসংখ্য বিশাল স্তম্ভগুলি যেন বিশাল ঐরাবতদের পায়ের মতো দুলে উঠছে চলার বেগে। খোদিত লতাপাতা যেন যুদ্ধের পতাকার মতো পরস্পরকে জড়িয়ে উড়ছে। সমর-অভিযানের বিচিত্র বিপুল শব্দ মিলে এনেছে বধিরতার স্তব্ধতা। বিশাল ঘণ্টা দুলে উঠেছে আর অর্গান থেকে উঠেছে বজ্রনির্ঘোষ। সমস্ত চূড়া ও ছাদ থেকে যেতে যেতে তৃষ্ণার্ত মকরমুখে তুরী-ভেরীর উঠছে গর্জন, ক্যাথিড্রাল-এর বেদীতে দারুণ এভ্যানজেলিণ্ট-এর গৃধ্ররাজ তার কংাস্য পক্ষ ঝাপটাচ্ছে।'

কিন্তু, গদ্য-রচনা তাঁকে বিশিষ্ট গৌরব দিয়ে থাকলেও চেস্টারটনের অমরত্বের দাবী তাঁর কাব্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত বলতে হবে। ইংরাজী কাব্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে 'দি ওয়াইল্ড নাইট' (The Wild Kight)' বার হবার পর অনেক নতুন অসাধারণ সুর শোনা গিয়েছে। ইংরাজী কাব্য অনেক মোড় ফিরেছে, অনেক অপরিচিত পথে যাত্রা করেছে। কিন্তু, তবু চেস্টারটনকে পিছনে পরিত্যক্তদের একজন বলতে পারা যায় না। তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যে যে শিখরে স্থান

করে নিয়েছেন, কোনো সুদূর পথ তাকে উপেক্ষা করে ভুলতে পারে না।

চেস্টারটন আধুনিক কবিতার মুক্তি-মন্ত্র সম্বন্ধে সন্দিহান শুধু নন—তার প্রতি একান্ত বিরূপ। তিনি বলেন—

"If free verse, is poetry, then lying in a ditch is architecture."

অর্থাৎ, ছন্দোমুক্ত রচনা যদি কাব্য হয় তা হলে খানায় শুয়ে থাকাও স্থাপত্য।

তাঁর মতামত নিয়ে তর্কের প্রয়োজন নেই, কিন্তু এটুকু তাঁর সঙ্গে যাদের মতের গরমিল আছে, তারাও বলতে বাধ্য যে, নিজের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম কবিতার বই 'দি ওয়াইল্ড নাইট' (The wild knight)-এ যখন 'কিংস্ ক্রশ-স্টেশন (king's cross station) সম্বন্ধে পড়ি—

বৃত্তাকার এই যে বিশ্ব, মানুষ যার বিধাতা
তারও আছে সূর্য-তারা, সবুজ সোনালী লাল
আর আছে ঘন ধোঁয়ার মেঘলোক,
স্তরে স্তরে সুদূর পর্যন্ত ভেসে যা ঢেকে রেখেছে,
উর্ধ্বের লৌহাকাশ।
হায় বিধাতা! নিজেদের মর্যাদা
কোনো দিন কি আমরা দেবো?
যুগান্তরের আগে দেখতে পাবো একটি তার মুহূর্ত

দেখবো—বন্যা ও বহ্নির গর্জমান তুরঙ্গ-বাহনে
ঘূর্ণায়মান মানুষের এই রূপ!
কিম্বা আবার নিয়তি সেই ধূসর প্রহসন করবে
অভিনয়
অপেক্ষা করবে তারই জন্যে
কালের ধ্বংসাবশেষও ক্ষতচিহ্নের মাঝে
যে এই ভগ্নস্তূপকে করবে প্রশ্ন,—
কোন সে কবির জাত
তারকালোভী এ বিরাট খিলান
এখানে তুলেছিল?'
আবার পড়ি—
'রাত্রির তারকা-চিত্রিত রূপালী ধূমল স্তব্ধতা-মসৃণ চিতা
পড়ল লাফিয়ে;
তিনটি দ্বার খোলা, তবু
আলোর প্রান্ত গেল এঁটে
ফাঁদের মতন!
স্তব্ধতা একটা ঝঙ্কার!
চিতার মতো সেই দারুণ তারকাময় আকাশের তলায়
গুমোটের সারারাত ধরে আমি দুঃস্বপ্নের সঙ্গে যুঝলাম
মৌন অতিকায় স্বপ্ন, যুদ্ধহীন জয়-গৌরবের
নিঃশব্দ ভেরীর আর স্তব্ধ ঘণ্টার—
ম্লান রাজ-সমারোহ গেল চলে আমার সম্মুখ দিয়ে
শিরস্ত্রাণ আর শৃঙ্গকিরীট আর ভারী পুষ্পমাল্য,

তাদের বিচিত্র উচ্চ নিশান আকাশে ঝোলান ;
তাদের বিশাল ঢাল যেন মৃত্যুর দ্বার !'

তখন তাঁর কবি-প্রতিভা বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়। এখানে তাঁর আর একটি কবিতার অনুবাদ দেওয়া হলো :—

বিস্ময়-কৃপাণ !

কঙ্কাল হ'তে কর বিশ্লিষ্ট কৃপাণে দেব ;
মহীরুহ সম দাঁড়াক ভয়াল নগ্নতায়।
সমুৎক্ষিপ্ত অরণ্য যারে করে উধাও
সে হৃদয় মোর হেরি তাহা হোক
চমৎকৃত।
শোণিত হইতে কর বিযুক্ত , আঁধারে শুনি
পিতামহদের প্রাচীন লোহিত যে মহানদী,
পাতাল বাহিনী বহুমুখী স্রোতে
সাগরে মেশে
গহন তিমিরে তবু সবিতারে না দেখে কভু।
ঐন্দ্রজালিক আঁখি দাও মোরে ; দেখি নয়ন
—উতরোল নদী হলো জীবন্ত মাঝারে মোর
স্ফটিক দারুণ—যাহা কিছু
পরিদৃশ্যমান,
তারো চেয়ে যাহা কল্পনাতীত, অবাস্তব।
আত্মা হইতে কর বিভক্ত ; হেরিব মোর
রুধির-স্রাবী ক্ষতমুখ—সম যত'না পাপ,
দুঃসাহসিক জীবনস্পন্দ ; নিজেরে যাহে

বৃষ্টি এল

উদ্ধার করি পথের অচেনা
পথিকে যথা।

চেস্টারটন হাল্কা ব্যঙ্গ-কবিতাও অজস্র লিখেছেন। শেষের দিকে এই ধরনের কবিতাই তাঁর হাত দিয়ে বেশি বেরিয়েছে। সমালোচকেরা এ সমস্ত কবিতাকে অত্যন্ত উঁচু স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতে অধিকাংশ কবির ব্যঙ্গ-কবিতাই ছড়ার বেশি সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয়; চেস্টারটন-এর ব্যঙ্গ-কবিতা কিন্তু সত্যকার কাব্যের মর্যাদা দাবি করতে পারে।

৬২ বৎসর বয়সে চেস্টারটনের মৃত্যু অকালেই হয়েছে বলতে হবে। বয়স তাঁর শুধু পাঁজির পাতাতেই জমা হয়েছিল, জীবনে তার কোনো ছাপ ছিল না। তাঁর মনের যৌবন শেষদিন পর্যন্ত ছিল অক্ষুণ্ণ। ১৯০০ সনের 'ওয়াইল্ড নাইট' (Wild knight)-এর তরবারি ১৯৩৬-এও সমান ভাবে ঝলসে উঠেছে, তেমনি দুরন্ত আগ্রহ তাঁর দেখা গিয়েছে দুঃসাহসিক অসাধ্য সাধনের অভিযানে। তাঁকে এমন অসময়ে হারাবার কথা তাই কারুর মনে হয় নি। সাহিত্যে তিনি মুক্ত হাতে পথের দু'ধারে যে অজস্র দান ছড়িয়ে গিয়েছেন, তার মূল্য নিয়ে এর পরে হয়তো একটু আধটু মতভেদ হতে পারে, কিন্তু প্রাণের প্রাচুর্যে উচ্ছল যে হাস্য-সরস অপরূপ স্বর চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল, তার জন্য বেদনাবোধ করবেন না, এমন সাহিত্য-রসিক বোধ হয় কোথাও নেই।

ভাবী কাগজের কৈফিয়ৎ

নতুন কাগজ বার করতে হলে প্রথমেই একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া নাকি দস্তুর। কেন যে দস্তুর তা অবশ্য বোঝা যায় না। কৈফিয়ৎ শোনবার জন্যে দেশ শুদ্ধ লোক কান পেতে থাকে বলে তো মনে হয় না! নতুন কাগজ বের করাটাই যদি লজ্জাকর অপরাধ হয় তাহলে কৈফিয়ৎ দিয়ে তার দোষ খণ্ডাবার আশা বৃথা। তবুও কৈফিয়ৎ একটা দেওয়া চাই। পাঠক সাধারণ সে কৈফিয়ৎ কোনো দিন পড়ে না এইটুকুই যা ভরসা।

নতুন কাগজের কৈফিয়তের ভাষা ভঙ্গি যতো রকমেরই হোক তার বক্তব্য আবহমান কাল থেকে বোধ হয় এক। আইভরি ফিনিশ থেকে নিউজপ্রিণ্ট সব কাগজই যুগান্তর সাধনের জয় পতাকা হয়েই বার হয়। সাহিত্য কি রাজনীতি স্বাস্থ্য কিম্বা কৃষি, হোমিওপ্যাথি কি ব্যবসাবাণিজ্য, কাগজ যে বিষয়েরই হোক 'যদা যদাহি···' বলেই সকলের যাত্রা শুরু। কিন্তু অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে গোড়াতেই স্বীকার করছি আমাদের প্রস্তাবিত পত্রিকার সে রকম কোনো স্পর্ধা নেই। সত্যিকথা, বলতে কি, এ কাগজ বার করবার কোনো সঙ্গত কারণ আমরাই ভেবে বার করতে পারিনি। এ কাগজ বার যদি না হয় তবে দুনিয়ার কোনো ক্ষতি হবে বলে মনে করতে

পারছি না, বার হবার পরও প্রেসের মালিক ও জন কয়েক হকার ছাড়া কারুর কোনো উপকার হবে কি না সে বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ আছে। তবু কাগজ বেরুবে—একটু অপ্রস্তুত কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবেই বেরুবে।

সঙ্গত কারণ না থাকলেও কাগজ বার করবার অসঙ্গত কারণ দু' একটা নেই এমন নয়। তার প্রথম হলো এই যে, কাগজ বার করাটা আমাদের খুশি। খুশি মতো কাগজ আমরা বার করছি, খুশি হলে এ কাগজ কেউ পড়ে দেখতে পারেন, তার বেশি কোনো জুলুম আমরা করবো না হলফ করে বলে রাখছি। নিছক খুশির মতো আজগুবি কারণে কাগজ বার করা যদি কারুর পছন্দ না হয়, খুশি না বলে যদি কেউ একে নিরর্থক কণ্ডুয়ন বলতে চান তাহলেও আমাদের প্রতিবাদ করবার কিছুই নেই। অহেতুক খুশি ছাড়া এ কাগজ বার করবার পেছনে আর কোনো প্রচণ্ড তাগিদ থাকবে এ-কথা বলতে আমরা নারাজ।

অসঙ্গত কারণের মধ্যে আর একটা সখ বা খেয়ালের উল্লেখও বোধ হয় করা যায়। রাজনীতির জগতে আমাদের বেড়ি নাকি ভেঙেছে। সেই বেড়ি-ভাঙা প্রাণের বেগ আর সব ক্ষেত্রে কি ভাবে উথলে উঠছে তা পরখ করে দেখবার সখও এ কাগজ বার করবার অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। কাগজ হাল্কা জিনিস, কিন্তু ঘুড়ি করে উড়িয়ে দিলে হাওয়া কোন দিকে বইছে অন্তত টের পাওয়া যায়।

কাগজ মাত্রেই তো কোনো না কোনোরকম পাহারা

সুতরাং—কাগজের নাম ধরা যাক পাহারা। নাম শুনে পাছে কেউ ভুরু কোঁচকান সেই জন্যে ভবিষ্যৎ পত্রিকায় আমাদের ক্ষমতার দৌড় প্রচ্ছদপটেই আমরা জানিয়ে রাখবো ঠিক করেছি।

পাহারা দিতে কেউ আমাদের ডাকেনি, সে বিষয়ে কোনো যোগ্যতার দাবিও আমাদের নেই। সখের পাহারায় নিজেরাই আমরা সেজে বেরিয়েছি। ওপর থেকে কোনো ফরমান আমরা পাইনি। কাউকে কোতল করবার দুরাশাও আমাদের নেই। আমাদের হাঁক ডাকে কোথাও কোনো গৃহস্থ নিজে সাবধান যদি হয় তাহলেই আমরা চরিতার্থ। জনে জনে নিজে নিজে সজাগ থাকাটাই আসল কথা বলে আমাদের বিশ্বাস। যে দেশে সমাজ কি মানুষ পরের পাহারার ভরসায় ঘুমোয় তার কোনো পরিত্রাণ নেই বলেই আমরা মনে করি।

সখের পাহারার একটা সুবিধে এই যে, তার শাসনের দাম যেমন নেই তেমনি তার চৌহদ্দিও কোথাও বাঁধা নয়। চৌরাস্তার মোড় থেকে কাণাগলি পর্যন্ত যেখানে খুশি আমরা রোঁদে বেরুতে পারি। তবে সত্যি কথাটা বলে ফেলি, চৌরাস্তা থেকে গলির পাহারার দিকেই আমাদের ঝোঁক, সাগর নদীর সাউখুড়ি করার চেয়ে গলির নর্দমা সাফ করার দিকেই আমরা নজর দিতে চাই। কামান যদি আমাদের কোনোরকমে জোটে তো মশা ছাড়া আর কিছুর বিরুদ্ধে ছোড়ার মানে আমরা বুঝি না। কারণ মশারাই সব নষ্টের

মূল। মশাদের অবহেলা করলেই শেষ পর্যন্ত মহিষাসুররা কাঁধে চেপে বসে দৌরাত্ম্য করবার সুবিধে পায়।

লড়াই-এর আগে যেমন পাঁয়তাড়া, এই কৈফিয়ৎ তেমনি, আসল আসরে নামবার আগে, কাগজ বার করবার মহলা মাত্র। কাগজের এই ভূমিকা যাঁদের হাতে পড়বে, তাঁদের এটিকে আমাদের সওদার নমুনা হিসেবে তাই গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। এ নমুনা তাঁদের মনঃপূত হলে অত্যন্ত খুশি হবো। কিন্তু না যদি হয় তাহলেও পাওনাদারদের তাগাদায় দেশছাড়া হওয়ার আগে রণে ক্ষান্ত হবো এমন কথা দিতে পারছি না।

হল-রেখা

কিছুদিন আগে ছিলাম অসমতল মাটির দেশে। আজ হঠাৎ এই সহরের মাঝখানে দেয়ালে ঘেরা ঘরের মাঝে বসে থাকতে থাকতে সেই বন্ধুর দেশের খানিকটা ছবি মনের ভিতর ভেসে এল যেন বন্যাস্রোতে। বন্যাস্রোতের উপমাটা ইচ্ছে করেই ব্যবহার করলাম কারণ সেখানকার ঢেউ-খেলানো মাঠের ওপর হলকর্ষণের সুদীর্ঘ রেখাকে আর কিছু দিয়ে ভালো করে বোঝানো যায় না। কোনোদিন ট্রেন থেকে হঠাৎ জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে, হয় তো আমি লাঙ্গলের ফলায় খোদা সেই বিশাল রেখার উল্কাবেগ দেখেছিলাম। উল্কাবেগ ছাড়া সে আর কি? কর্ষণ-রেখাগুলি যেন বিশাল তীরের ফলা, আকাশবৃত্ত অনুসরণ করে চলেছে ছুটে। তারা যেন ভয়ঙ্কর কোনো পশুর উল্লম্ফন, পাহাড় ডিঙিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে ওপারের অনিশ্চয়তায়, কিম্বা বলা যায় তারা যেন বিশাল কোনো বাহিনীর উন্মত্ত অভিযান—পাহাড় বেয়ে উঠেছে দুর্বার বেগে। কে বলবে তারা শুধু মাটির উপর কয়েকটা দাগ মাত্র—তারা যেন জীবন্ত—দেখলে মনে হয় বেদুইনরা যেন চলেছে মরু পার হয়ে দুরন্ত বেগে, যেন কোনো পাগলাঝোরা, গিরিশৃঙ্গের বিরুদ্ধে করছে আস্ফালন।

হলকর্ষণের এই যে রেখাগুলি, এরা এক হিসেবে বুঝি তীরের চেয়েও বেগবান, বেদুইনদের চেয়ে দুর্ধর্ষ, পাগলা-ঝোরার চেয়েও উদ্দাম আনন্দ-গান-মুখর। কিন্তু তবু এ-কথা ঠিক যে রেখাগুলি অনেক ধৈর্য-সহকারে, বহুপরিশ্রমে কৃষককে কাটতে হয়েছে দিনের পর দিন। মাটির ওপর এ অদ্ভুত অক্ষর যারা লিখেছে তারা চেয়েছিল লাঙ্গলের ফলায় সোজা কয়েকটা রেখা টানতে। শিল্পীর কল্পনা তাদের ছিল না। তারা জানেনি যে, এ রেখা হয়ে উঠবে জীবন্ত গতি, —বিদীর্ণ মৃত্তিকার বন্যাস্রোত। অসীম ধৈর্য নিয়ে, শান্ত অনাড়ম্বর ভাবে তারা দিনের পর দিন হল চালনা করে গিয়েছে, আর দেবতার আশীর্বাদে তাদের সে হল-চিহ্ন হয়ে উঠেছে অপরূপ আনন্দের সৃষ্টি।

এই হল-রেখায় আমার মন চিরদিন অপরূপ এক আনন্দ পেয়েছে, কিন্তু সে আনন্দের হেতু আমি বুঝি নি কখনো। কারুর কারুর মনের গঠন এমনি, যে, তারা কোনো ব্যাপারের হেতু না বুঝলে তাতে খুশি হতে পারে না, দুনিয়ার আরো অনেক আছে আরো চালাক লোক, যারা বলে যে, কোনো কিছু বুঝতে পারলেই তাদের আনন্দ যায় উবে। দেবতাদের ধন্যবাদ যে, অতো চালাক আমি কোনোদিন নই—যা বুঝি এবং যা বুঝি না এমন অনেক কিছুতেই আমার মনভরে ওঠে খুশিতে।

কিন্তু কর্ষিত মৃত্তিকার এই অপরূপ মহিমার মানে বোধ হয় আমি বুঝি। এর আসল রহস্য এইখানে যে পৃথিবীর

সমস্ত সত্য ও সারবান জিনিসের মতো, রেখাগুলি, সোজা করে তৈরি হয়, ঋজুতাই আদর্শ করে নেয় বলেই, যায় বেঁকে। সুন্দরভাবে যা কিছু বেঁকে যায় তাদের সবার ভিতর থাকে ঋজুতার নিষ্ঠা। গুণটানা বাঁকা ধনু সুন্দর, কারণ সে চায় সটান হয়ে থাকতে। তলোয়ারের ফলা বিদ্যুতের মতো আলোকের খেলা দেখাতে পারে কারণ সোজা থাকাই তার ধর্ম। গাছের ডালের বক্রতা, নদীর বাঁক সব কিছুর বেলা এই এক কথাই খাটে। প্রকৃতির ভিতর নিছক দুর্বলতায় ভেঙে পড়ার সৌন্দর্য নেই। সরলতার অটল নিষ্ঠা, ন্যায়-বিচারের মতো করুণায় হেলে যায় বলেই সৃষ্টি সুন্দর। এই নিখিল যেন বিশাল সরল রেখার একটা নক্সা—আনন্দে আর করুণায় তার কাঠিন্য গিয়েছে নম্র হয়ে। সব কিছু চায় ঋজু থাকতে, আর দেবতার আশীর্বাদে সম্পূর্ণ ভাবে তা পারে না।

নিছক বক্রতার কোনো মহিমা নেই, নেই কোনো সৌন্দর্য ; তার আরেক নাম কুটিলতা। যুদ্ধে তলোয়ারের ফলা বেঁকে যেতে পারে, বেঁকে যাওয়াই তার কাজ, কিন্তু বেয়াড়াভাবে বাঁকা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ হয় না। জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে স্থির লক্ষ্য, আর ধ্রুব ধর্মের একটু অদলবদল হতে পারে কিন্তু তা বলে অনির্দিষ্ট লক্ষ্য আর চঞ্চল আদর্শ নিয়ে আরম্ভ করা যায় না কাজ। আগে থাকতেই বেঁকে যাবার কোনো মানে হয় না। ঋজুতার নিষ্ঠা থাক একান্ত, গাছেদের মতো, জীবন আপনি দেবে সুন্দরভাবে বাঁকিয়ে।

কিন্তু আগেই বুঝি নীতি আউড়ে বসলাম। তবে তা না আওড়ালে কর্ষিত মৃত্তিকার এই বিরাট চিত্রের সম্পূর্ণ অর্থ ও ইঙ্গিত বোধ হয় বোঝাতে পারতাম না।

পৃথিবীর ওপর হল-রেখার এই যে অভিযান এই হলো মানুষের সব চেয়ে প্রাচীন স্থাপত্য, সবচেয়ে পুরাতন জ্যোতির্বিদ্যা তাকে পথ দেখিয়েছে ; প্রাচীনতম উদ্ভিদবিদ্যা তার লক্ষ্য—আর জ্যামিতি ? ওই শব্দটিতেই আমার বক্তব্য আছে নিহিত।

এই কর্ষিত রেখাগুলির দুরন্ত বেগের দিকে চেয়ে আমি যেন গণ-শক্তির বিরাটতম কীর্তি আর মহিমা বুঝতে পারি। এখানে পরিপূর্ণ সাম্য। সমান্তরাল রেখা চলেছে পাশাপাশি ; কিন্তু এই সাম্যের রূপ, যে কোনো রাজ-সমারোহের চেয়ে বিস্ময়কর। সমান্তরাল বলেই রেখাগুলির রূপ পৃথিবীকে বিচিত্র করে তুলেছে, সমান বলেই তারা গিয়েছে সম্মুখপানে এগিয়ে সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়ে অজেয় বাহিনীর মতো।*

* বিদেশী ছায়ায়।

অর্ধোদয় যোগ

মানুষের বিশাল জনতার একটি অপরূপ মহিমা আছে। জন-সমুদ্র আমাদের মনকে অদ্ভুত ভাবে দোলা দেয়। অকস্মাৎ আমরা অনুভব করি আমাদের ব্যক্তিগত সত্তা হারিয়ে গিয়েছে বিশালতর আর এক সত্তায়। সাগর-সঙ্গমের উতরোল উল্লাসে নদীর দুই তীরের ব্যবধান বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

জনতায় আমরা আর এক সত্তায় উন্নীত হই, না নেমে যাই সে বিষয়ে অবশ্য মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। আধুনিক কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক গণ-মনকে বিশেষ স্নেহ বা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। জন-গণেশের বুদ্ধিটা তাঁদের মতে তার শুণ্ডের মতোই স্থূল। তাঁরা মনে করেন, মত্ত হস্তীর মতো তার বেগই আছে বিবেক নেই,—নেই বিচারবুদ্ধি। যখন সে ধাবমান হয়, তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান তার থাকে না।

জনতার মাঝে বিলুপ্ত হয়ে আমরা সাধারণ অবস্থায় অসম্ভব অনেক কাজ যে করতে পারি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের ব্যক্তিগত বিচার বুদ্ধি বিবেচনার চেয়ে প্রবলতর আরেক শক্তি তখন আমাদের পরিচালিত করে। কিন্তু সে

শক্তি সব সময়েই যে অশুভ ও অন্ধ এ-কথাও সত্য নয়। জনতা জোয়ান দার্ককে কখনো কখনো পুড়িয়ে মারে সত্য কিন্তু 'বাস্টিল'ও ভাঙে।

আর কিছু না হোক বহু মানবের সমবেত রূপের মাঝে নিজকে বিপুলভাবে জানার একটা সার্থকতা আছে। জনতায় নিজের সত্তাকে নিমজ্জিত করে স্নাত হওয়া প্রত্যেকেরই প্রয়োজন মনে করেই বোধহয় আমাদের শাস্ত্রকারেরা বিপুল জন-সম্মিলনের আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন বড় বড় তীর্থক্ষেত্রের পুণ্যক্ষণের মেলায়। তীর্থে আমরা ঘর ছেড়ে আসবো উদার প্রকৃতির মাঝে এবং নিজেদের সঙ্কীর্ণসত্তা ছেড়ে মিলবো বিশাল জন-সমুদ্রে, এই ছিল বোধ হয় তাঁদের উদ্দেশ্য।

এই সেদিন অর্ধোদয় যোগ উপলক্ষ্যে জন-সমাগমের যে বিরাট রূপ প্রত্যক্ষ করলাম তাতে প্রথমে সেই কথাই মনে হয়েছিল। জনতার মাঝে জন-গণেশের বিরাট কল্যাণরূপই রয়েছে ভেবেছিলাম।

কিন্তু সন্দেহ জাগলো সঙ্গে সঙ্গে। তীর্থের মেলার কোনো সুমহান উদ্দেশ্য কি সত্যই সাধিত হলো এই জনতায়? মানুষ কি নিজেকে প্রসারিত করতে পারলে বিপুলতর সত্তায়? মনে হয় না।

কাল গিয়েছে বদলে। তীর্থযাত্রার সে রূপ তো আর নেই। তীর্থ আছে যথাস্থানে, পুণ্যক্ষণও দেখা দেয় পঞ্জিকার পাতে কিন্তু যাত্রা আমরা করি কই?

সেদিন যাত্রাটাই ছিল প্রধান। পরিচিত সঙ্কীর্ণ আবেষ্টন ছেড়ে মহত্তর, স্থূল প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো উদ্দেশ্যের জন্য যাত্রা। দুর্গম দীর্ঘ পথের প্রতি বাঁকে, জীবনকে যা সঙ্কীর্ণ করে রাখে, সেই সমস্ত অনাবশ্যক, অর্থহীন আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আমরা অগ্রসর হতে পারতাম।

কিন্তু আজ আমরা শুধু ট্রেনে চেপে বসি। সেদিনকার পথে ছিল অনিশ্চয়তা, ছিল বিপদ, ছিল অপ্রত্যাশিতের সম্ভাবনা। তার জায়গা নিয়েছে শুধু ভিড়ের গ্লানি আর অসুবিধা। আজ আমাদের শুধু টিকিট কেনার অর্থ সংগ্রহ করতে পারলেই হলো কোনোরকমে। পশুপালের মতো যন্ত্রযান আমাদের স্তূপাকার করে বহন করে আনে। অন্ধ জড় প্রবাহের মতোই তারপর নির্দিষ্ট কাজ সমাপন করে আবার ট্রেনে চেপে বসি। উদারতার মাঝে মুক্তির বদলে আমাদের মন থাকে সংস্কারে এবং দেহ থাকে অসুবিধার মাঝে সঙ্কীর্ণ হয়ে।

ট্রেনের কল্যাণে পুণ্যলাভ এখন সহজ হয়ে গিয়েছে। শারীরিক গ্লানি ভোগ করা ছাড়া আর আমাদের কোনো সাধনা তার জন্যে করতে হয় না। কিন্তু সহজ হওয়ার সঙ্গে তীর্থের মাহাত্ম্যও গিয়েছে ম্লান হয়ে। দুঃসাধ্য বলেই যা মূল্যবান, সুলভ করে তুললে তার কোনো সার্থকতাই থাকে না।

অর্ধোদয় যোগে পুণ্য আমরা কতখানি অর্জন করেছি

জানি না। কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানী থেকে শুরু করে ওৎ-পেতে-থাকা নানা ধরনের সাধু অসাধু ব্যবসাদারমহলকে যে সমৃদ্ধ করে তুলেছি এ-কথা সত্য। কয়েক কোটি টাকা শুধু এই পুণ্য অর্জনের নেশাতেই আমরা ব্যয় করেছি। দেশের এই অর্থাভাব ও অন্নাভাবের দিনে এই কয় কোটি টাকার কথা নির্বিকার ভাবে ভুলে থাকা একটু কঠিন। গঙ্গার জলে বিশেষ কোনো অসাধারণ শুভক্ষণে ডুব দেওয়ার পুণ্য হয়তো অসীম, কিন্তু নিজেদের অন্নের সংস্থান যারা করতে অক্ষম, পুণ্য যতো বড়ই হোক তাতে তাদের অধিকার আছে কি? কিছুতেই যে এ-কথা ভোলা যায় না যে, এই কয়েক কোটি টাকায় বাঙালায় পঞ্চাশটি প্রায় কাপড়ের কলই হতে পারতো। বাঙলার বর্তমান অবস্থায় পঞ্চাশটি কাপড়ের কলের মূল্য যে কতোখানি তা বেশি করে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন বোধ হয় নেই। যে বেকার সমস্যা আমাদের জাতির অসংখ্য অমূল্য জীবনকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে, এই মিলগুলির দ্বারা তার ভালো রকম মীমাংসা হতে পারতো। বহু বেকার যুবকের কাজ মিলতো—বহু দুঃস্থ সংসারের মুখে আবার হাসি ফুটতো। সে মিলের বস্ত্রে আমাদের দেশের গ্লানিকর দারিদ্র্যের লজ্জা নিবারিত হতে পারতো। বাংলাদেশকে সামান্য অন্ন বস্ত্রের জন্যে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো না। অর্ধোদয় যোগে স্নানের ফলে স্বর্গে আমাদের জন্যে কি সৌভাগ্য সঞ্চিত হলো বলতে পারি না। কিন্তু দেশ ব্যাপী যে অভাব আমাদের আত্মাকে পঙ্গু করে

রেখেছে তাকে আমরা বাড়িয়েই তুললাম মাত্র। মানুষের কল্যাণের চেয়ে স্নানের পুণ্য যদি বড়ও হয় মনে করি তবু মর্তের প্রয়োজনে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যকে বিসর্জন দেবার কি সময় আসেনি?